হিন্দ স্বরাজ্য

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

কলিকাতা

বৈশাখ, ১৩৩৭

রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের দ্বারা
প্রকাশিত

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৮১।৩০

নিবেদন

বিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দ্ স্বরাজ্য লিখিত হয়। ঋষি তখন তপস্যায় বসিয়াছেন—ভারতবর্ষের মুক্তির পথ কি তাহারই সন্ধান জানিবার জন্য তপস্যা। সেদিন তাঁহার ধ্যানের ভিতর দিয়া মুক্তি-পথের যে ইঙ্গিত ধরা পড়িয়াছিল তাহাই "হিন্দ্ স্বরাজ্য।" "হিন্দ্ স্বরাজ্য" স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ।

ঋষির উচ্চারিত মন্ত্র যেমন কেবল কথার সমষ্টিমাত্র নহে, তাহা শক্তি ও সত্যের সমাবেশ, গান্ধীজীর প্রণীত এই গ্রন্থখানিও তেমনি মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির বাণীতে পরিপূর্ণ একটি অখণ্ড মন্ত্র বিশেষ। ঋষির মন্ত্র যেমন সমস্ত কালের জন্য অভ্রান্ত সত্য, ভারতবর্ষের নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে এ গ্রন্থের উপদেশগুলিও তেমনি অভ্রান্ত সত্য। তাই বিশ বৎসর আগে মহাত্মাজী যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আজ বিশ বৎসর পরেও তাহার ভিতর কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

গান্ধীজীর ভিতর এক সঙ্গে দুইটি জিনিষকে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে দেখা যায়—ঋষির দিব্য-দৃষ্টি এবং কর্ম্ম-যোগীর কর্ম্ম-সাধনা। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ধ্যানে তাঁহার যে পথ ধরা পড়িয়াছিল, আজ কাজের ভিতর দিয়া সেই পথকে গড়িয়া তুলিবার সাধনা তাঁহার চলিয়াছে। তাই ত আজ তাঁহার এই সত্যাগ্রহ অভিযান। দেশের লোক এ আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। কিন্তু আদর্শ কি, কাম্য কি, কর্ম্ম-পদ্ধতি কি, তাহা না জানিলে এ সব সংগ্রামে সমান তালে পা ফেলিয়া সঙ্গে চলা যায় না—অভিযান ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা থাকে।

বাংলার নর-নারী গান্ধীজীর পথের সম্বন্ধে যাহাতে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া তুলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই হিন্দী "হিন্দ্ স্বরাজকে" আমি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছি ভগবান বাংলার নর-নারীকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার শক্তি দান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ভূমিকা

ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই ছোট বইখানা খুব চলতি হইয়াছে। মূল বইখানা গুজরাটী ভাষায় লেখা। এই বইখানা যে ভাবে বাহির হইয়াছিল তাহা আশ্চর্য্য রকমের। এ খানা প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায় "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" নামক পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯০৮ সালে যখন আমি জাহাজে চড়িয়া লণ্ডন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিতেছিলাম সেই সময় ভারতবর্ষের মধ্যে যে দল বল-প্রয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের শাসন বদলান যায় বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য ইহা লেখা হয়। অরাজকতা-প্রিয় যে সকল ভারতবাসী লণ্ডনে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নামজাদা, সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের বীরত্বের জন্য আমার মন তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের পথ ঠিক পথ নহে। ভারতবর্ষের যে রোগ তাহার জন্য লাঠ্যৌষধি চলিবে না, এই ছিল আমার বিশ্বাস। ভারতবর্ষের আচার ও সভ্যতার সহিত খাপ খায়, অথচ তাহার জোর লাঠির চাইতে বেশী আমি এমনি ধরণের অস্ত্র চাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেই সময় পুরা দুই বৎসরের পুরাতন না হইলেও, উহা কি জিনিষ তাহা বোঝা গিয়াছিল। সুতরাং সে বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলাও যায়। আমার এই লেখা লোকের এত পছন্দ হইয়াছিল যে, উহা পুস্তক আকারে বাহির করা হয়। ভারতবাসীরাও এই বইখানার পরিচয় পান। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ঐ বহির প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। আমি ঐ বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ ছাপাইয়া গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যের জবাব দিই। আমার মনে

হইয়াছিল যে, আমার যে সকল ইংরাজ মিত্র ছিলেন তাঁহাদিগকে এই বইয়ের বিষয় জানান দরকার ছিল। আমার বিশ্বাস, আমার এই বইখানি ছোট ছেলেকেও পড়িতে দেওয়া যায়; ইহাতে শত্রুতার বদলে প্রেমেরই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে উশৃঙ্খলতার বদলে স্বার্থত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতে পশুবল বা জবরদস্তির বদলে আত্মিক বলের কথা বলা হইয়াছে। এই বই কয়েকবার ছাপা হইয়াছে এবং ইহা পড়িয়া লোকের লাভ হইতে পারে; এই বইতে কেবলমাত্র একটী শব্দ ছাড়া আর কিছুই আমি বদলাইতে চাই না; এবং তাহাও বদলাইতে চাই একজন ইংরাজ মহিলার অনুরোধে। *

এই বইখানায় এখনকার সভ্যতার খুব কড় নিন্দা করা হইয়াছে। আজকাল এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইয়াছে যে, এখনকার সভ্যতা বড় খারাপ। আমার বিশ্বাস যদি ভারতবর্ষ এখনকার সভ্যতা একেবারেই ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে উহাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না।

এই বইয়ের পাঠককে এই দিকে বিশেষ করিয়া খেয়াল রাখিতে বলি যে, যে স্বরাজ্যের কথা এই বইতে বলা হইয়াছে সে প্রকার স্বরাজ আজই আমরা চাহিতেছি না। আমি জানি যে, ভারতবর্ষ ঐ রকম স্বরাজের জন্য আজ পুরাপুরি তৈয়ার হয় নাই। এ কথা বলিলে কেহ কেহ হয়ত তাহা আমার অহঙ্কার বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু যে স্বরাজের ছবি এই বইয়ে আঁকা হইয়াছে আমি সেই রকম স্বরাজ্য পাওয়ার জন্যই কাজ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু আমরা সকলে মিলিয়া যে স্বরাজ পাওয়ার

* এই বইতে এক জায়গায় পার্লামেণ্টকে বেশ্যার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এক ইংরাজ মহিলা ঐ শব্দটী লজ্জাজনক বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। এই কথাটাই উপরে বলা হইয়াছে।

চেষ্টা করিতেছি, উহা ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দ্বারা শাসন করার ধাঁচের স্বরাজ।

রেল বা হাসপাতাল নষ্ট করায় আমি লাভ দেখি না। কিন্তু যদি ঐ সকল নিজে নিজে নষ্ট হইয়া যায়—তবে আমি খুসী হইব। কত রেল চলিতেছে আর কত হাসপাতাল আছে, ইহা দিয়া উচ্চ সভ্যতার পরিচয় হয় না। রেল বা হাসপাতাল আদি এক রকমের পাপের সামিল হইলেও, আজ ঐ পাপ দূর করা মুস্কিল। হাস্‌পাতালে রোগীর উন্নতি যদিও হয় কিন্তু দেশের যে রোগ তাহার এতটুকুও উন্নতি হয় না। আদালতগুলি চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যাক, এটাও আমার কাছে ভাল মনে হয় না। তবে আমি ইহা প্রার্থনা করি যে, ঈশ্বর যেন করেন যে এগুলির আবশ্যক না হয়। তারপর, কলকব্জা ও মিল—এগুলিকে নষ্ট করিয়া দিলেও এখন দেশের বিশেষ লাভ হইবে না কেন না যতটা সাদাসিধা ও ত্যাগী হইলে এসকল ছাড়া চলে ততটার জন্য আজ দেশবাসী প্রস্তুত নহেন। আমাদের যে সকল কার্য্য করিতে হবে তাহার মধ্যে একমাত্র অহিংসাই আমরা পুরাপুরি কাজে লাগাইতে পারি। তবুও দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অহিংসা বা নিরুপদ্রবতার কথা যে ভাবে এই বইতে লেখা হইয়াছে ঠিক সেভাবে এখন কাজে লাগান হইতেছে না। যদি ভারতবর্ষ প্রেমের সঙ্গে কাজ করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইত—আর রাজনীতিতে উহা প্রয়োগ করিত তাহা হইলে আকাশ ফুঁড়িয়া স্বরাজ আমাদের হাতে আসিয়া পড়িত। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, সে দিন এখনো আসিতে বিলম্ব আছে।

এই সকল মন্তব্য এখানে করার দরকার এইজন্য যে, আজকালকার আন্দোলনকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য এই বই খুঁজিয়া যুক্তি দেওয়া

হয়। তাছাড়া আমি এমন লেখাও দেখিয়াছি যাহাতে বলা হইয়াছে যে, আমি গভীর চাল চালিয়াছি, আজকালকার অশান্তিকে আমার খেয়াল অনুসারে কাজ করিবার জন্য ব্যবহার করিতেছি, আর সারা ভারতবর্ষে আমি নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করিতেছি। এই সকল কথার আমি এই উত্তর দিতে পারি যে, সত্যাগ্রহীর ভাণ্ডারে ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী জিনিষ পড়িয়া আছে। এই বইখানিতে কোনও কথাই গোপন করা হয় নাই, অথবা ভবিষ্যতে বুঝাইবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয় নাই। "হিন্দ্ স্বরাজ্য" বইখানাতে জীবনের যে ধারা দেখান হইয়াছে উহার এক অংশও নিঃসন্দেহে কাজে লাগান যায়, আর সারা অংশও কাজে লাগাইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু তথাপি যাহারা দেশের বর্ত্তমান সমস্যার সহিত সম্বন্ধ রাখেন তাঁহারা যে, এই বই হইতে কিছু কিছু লেখা উঠাইয়া লোককে বিগড়াইয়া দিবেন বা ভয় দেখাইবেন তাহাও উচিত নহে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১-২১

প্রস্তাবনা

স্বরাজ্য বিষয়ে লিখিত ২০টী অধ্যায় আজ পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। এই বিষয়গুলি আমি না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়াই লিখিয়াছি। অনেক পড়িয়াছি, অনেক বিচার করিয়াছি, বিলাতে ট্রান্সভাল-ডেপুটেশনের জন্য ৪ মাস ছিলাম, ঐ সময় যতটা পারিয়াছি ভারতবাসীদিগের সহিত এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছি, বহু ইংরাজের সহিত মেলামেশা করিয়াছি। তারপর আমার নিজের যাহা ভাল মনে হইয়াছে তাহাই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকার গুজরাটী গ্রাহক প্রায় ৮০০। প্রত্যেক গ্রাহক যে কাগজখানা ল'ন আর দশজনে তাহা পড়েন। যাহারা গুজরাটী জানেন না তাঁহারা অপরকে দিয়া পড়াইয়া শুনিয়া লইয়া থাকেন। এই রকম সব পাঠক ও বন্ধুগণ হিন্দুস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, ঐ রকম প্রশ্ন বিলাতেও আমি শুনিয়াছি। ইহা হইতে আমি স্থির করিয়াছি যে, যাহা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় আলোচনা করিয়াছি, উহা সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে দোষ নাই।

যে বিচার আমি প্রকাশ করিয়াছি উহা আমার নিজস্ব না হইলেও আমারই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন না, ঐ রকম ভাবে কার্য্য করিবার আমার আশা আছে। আমি বুঝিতেছি যে, উহা আমার হৃদয়ের ভিতরে একেবারে প্রবেশ করিয়াছে। যে বিচার করা হইয়াছে উহা আমার নহে একথা বলিবার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচার কেবল

আমিই করিয়াছি এমন নহে। আমার ঐ মত অনেক পুস্তক পড়ার পর গঠিত হইয়াছে। আমি যে সকল বিষয় সূক্ষ্মরূপে অনুভব করিয়াছি তাহার গোড়াটা নানা পুস্তকে পাইয়াছি। আমি যে সকল সিদ্ধান্ত পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত অনেক ভারত-বাসীরও আছে যাহারা এখনকার সভ্যতার ফাঁকিতে পড়েন নাই। ইউরোপের হাজার হাজার লোকও এই রকম সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। একথা আমার নিজের জানা আছে বলিয়া পাঠকদিগকে জানাইয়া দিতে চাই। যাহার সময় আছে তিনি ইউরোপীয়দের এই রকম পুস্তক ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন। যদি কখনও সময় হয় তাহা হইলে আমিও ঐ ধরণের পুস্তক হইতে কোন কোন খানা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব এমনও আশা করিতেছি।

'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র পাঠকের অথবা অন্য কাহারও মনে আমার এই লেখা পড়িয়া যে বিচার উপস্থিত হয়, উহা আমার নিকট জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

দেশের সেবা করা, সত্যের খোঁজ করা এবং সত্য অনুযায়ী আচরণ করার জন্যই এ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই জন্য আমি যদি কোথাও ভুল করিয়া থাকি তবে তাহা আঁকড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই। সাধারণতঃ দেশের হিতের জন্যই আমি এই ইচ্ছা করি যে, যদি আমার বিচার ঠিক হইয়া থাকে তবে অপরেও আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বুঝিবার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থ, পাঠক ও সম্পাদকের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছে—এই আকারে লেখা হইয়াছে।

শ্রীমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী

হিন্দ স্বরাজ্য

প্রথম অধ্যায়

কংগ্রেস ও উহার কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ

পাঠক—বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানে স্বরাজ্যের আবহাওয়া চলিতেছে। সারা হিন্দুস্থান মুক্তি পাইবার জন্য ছট্ফট করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ঐ ভাবেরই ঢেউ উঠিয়াছে। হিন্দুস্থানীগণ নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য খুব উৎসুক দেখা যায়। আপনি কি এই বিষয়ে আপনার বিচার দয়া করিয়া জানাইবেন?

সম্পাদক—আপনার প্রশ্ন ত ঠিক, কিন্তু জবাব দেওয়া সোজা নয়। খবরের কাগজের প্রথম কাজ হইতেছে, লোকের মনোভাব বুঝিয়া উহা প্রকাশ করা; দ্বিতীয়, লোকের মধ্যে ভাব জাগানো; তৃতীয়, কোনও কারণেই ভয় না করিয়া জন-প্রিয় মত বা কাজের ভিতর যে সব ত্রুটি আছে তাহা প্রকাশ করা। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে ঐ তিন কার্য্যই এক সঙ্গে করিতে হয়। কোনও বিষয়ে অন্ত পর্য্যন্ত লোকের বিচার প্রকাশ করিতে হইবে, যেখানে বিচার নাই সেখানে বিচার করিবার শক্তি সৃষ্টি করিতে হইবে, যে দোষ আছে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। সে যাহাই হউক, আপনি যখন প্রশ্ন করিয়াছেন তখন উত্তর দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

পাঠক—আপনার বিচার অনুসারে ভারতবর্ষে স্বরাজ্যের ভাব কি জাগ্রত হইয়াছে?

সম্পাদক—ইহা ত জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইতেই দেখা যাইতেছে। জাতীয় এই কথা দ্বারাই জাতীয় ভাব যে হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পাঠক—আপনি ভুল করিতেছেন। ভারতবর্ষের নূতন দল ত কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানে না। উহারা কংগ্রেসকে ইংরেজের রাজ্য চালাইবার অস্ত্র বলিয়া মনে করে।

সম্পাদক—নূতন দলের এই বিচার ঠিক মনে হয় না। হিন্দুস্থানের দাদা মহাশয় দাদাভাই নৌরজী যদি জমি না তৈরী করিতেন, তবে নূতন দল ঐ কথা বলিতে পারিতেন না। হিউম সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তিনি মুক্তির যে সকল পথ দেখাইয়াছেন এবং আমাদিগকে জাগাইবার জন্য যে জোর দিয়াছিলেন তাহা কেমন করিয়া ভোলা যাইবে? সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ কংগ্রেসের কথা মত কাজ যাহাতে হয় তাহার জন্য নিজের শরীর, মন ও টাকা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংরেজের রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার লেখা আজও পড়িবার উপযুক্ত। গোখ্‌লে লোককে তৈয়ারী করার জন্য নিজের জীবনের বিশ বৎসর নিতান্ত গরীবের মতই কাটাইয়াছেন। কংগ্রেসের সাহায্যে স্বরাজ্য-বীজ যাঁহারা বুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বদরুদ্দীন তায়েবজীর নাম প্রসিদ্ধ। এমনি বাংলা, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে অনেক হিন্দুস্থানী ও ইংরেজ আছেন যাঁহারা ভারতকেও ভালবাসেন এবং কংগ্রেসেরও সভ্য।

পাঠক—থামুন, থামুন, আপনি ত অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর আপনি অন্য কিছু কথার জবাব দিতেছেন। আমি স্বরাজ্যের কথা বলিতেছিলাম আপনি পর রাজ্যের কথা বলিয়া যাইতেছেন। আমার কাছে ইংরাজের নাম মাত্র

শুনিতে ভাল লাগে না, আর আপনি তাদের নামের ঝড় চালাইতেছেন। ওরকম করিলে চলিবে না। আমি স্বরাজ্য বিষয়েই আলোচনা করিতে চাই—অন্য বাজে কথায় আমার সন্তোষ হইবে না।

সম্পাদক—আপনি ভয় পাইতেছেন কেন? আপনি ভয় পাইলে ত আমার কাজ চলিবে না। একটু সবুর করুন, দেখিবেন আপনি যাহা চাহেন সেই কথাই আসিতেছে। আমার কথার মধ্যে বাধা দেওয়াতে আর হিন্দুস্থানের যাহারা উপকার করিয়াছেন তাঁহাদের আলোচনা যে আপনার ভাল লাগিতেছে না তাহাতে আমার মনে হয় আপনার নিকট হইতে স্বরাজ্য দূরে আছে। আপনার ধরণের লোক যদি বেশী থাকে তবে আমাদের উন্নতিতে বড়ই বাধা আছে। আমার কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

পাঠক—আপনার এই সকল গোলমেলে কথায় ত বোঝা যাইতেছে যে, আপনি আমার কথাই উড়াইয়া দিতে চাহেন। আপনি যাঁহাদিগকে উপকারী মনে করেন, তাঁহাদিগকে যদি আমি হিতকারী বলিয়া না মানি, তবে কি উপকারের কথা আপনি শুনাইবেন? যাঁহাকে আপনি হিন্দুস্থানের পিতামহ দাদাভাই নৌরজী বলিতেছেন তিনি হিন্দুস্থানের কি এমন উপকার করিয়াছেন? উনি তো আমাদের যাহা পাওয়া উচিত ইংরাজের কাছ হইতেই তাহা পাইব বলিয়া বিশ্বাস করেন; বলেন—উহাদের সহিত মেলা মেশা করিয়া থাক।

সম্পাদক—আমি আপনাকে বিনয়ের সহিত বলিতেছি যে, এই রকম মহাপুরুষের সম্বন্ধে বে-আদবী কথা বলা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। তাঁহাদের কার্য্যের আরও কিছু বিচার করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের জীবন হিন্দুস্থানের সেবায় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজেরা হিন্দুস্থানের রক্ত শুষিয়া লইতেছে একথা দাদাভাই-ই বুঝাইয়াছেন। ইংরাজের উপর যে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহাতে দোষটা কি হইয়াছে? আমরা যদি কথার জোরে তাঁহাদের চেয়ে আগাইয়া যাই, তবেই কি তাঁহারা খাটো হইয়া যাইবেন? তাহাতেই কি তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা অধিক বুদ্ধিমান হইয়া যাইব? যে সিঁড়ির সাহায্যে আমরা উঠিয়াছি সেই সিঁড়ির ধাপ ফেলিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কায নয়। যদি শেষ ধাপটা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত সিঁড়িটাই পড়িয়া যাইবে। আমরা আগে বালক থাকি, তারপর আমরা জোয়ান হই—তাই বলিয়া আমরা বাল্যকালকে ঘৃণা করি না, বরং সেই সকল দিনের কথা প্রেমের সহিত স্মরণ করি। অনেক দিন ধরিয়া শিখাইয়া বুঝাইয়া যে গুরু আমাকে পড়াইয়াছেন আজ যদি আমি তাঁহার অপেক্ষা কিছু বেশী শিখি, তাহা হইলেই আমি কিছু বেশী বুদ্ধিমান হইয়া যাইব না। আমার ত গুরুকে বরাবরই সম্মান করিতে হইবে। এই কথা মহাপুরুষ দাদাভাই সম্বন্ধেও বলা চলে তাঁহাদের পরে যে স্বরাজ্যের ভাবনা আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি একথা ত অস্বীকার করা যাইবে না।

পাঠক—ঠিক বটে। বুঝিলাম যে দাদাভাইকে সম্মান করা চাই। তাঁহাদের মত লোক ছাড়া এই জাগরণ দেখা দিত না। কিন্তু গোখ্‌লে মহাশয়কে ইঁহাদের মধ্যে একজন কেমন করিয়া বলা যায়? তিনিও বলেন যে, ইংরাজের কাছে আমাদিগের অনেক কিছু শিখিবার আছে। তিনি বলেন, প্রথমে তাঁহাদের রাজনীতি ভাল করিয়া বোঝা চাই, তারপর স্বরাজ্যের চর্চ্চা করা চাই। তাঁহার ব্যাখ্যায় ত আমার প্রাণ উড়িয়া যায়।

সম্পাদক—প্রাণ যে উড়িয়া যায় তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, আপনার ধৈর্য্য নাই। পিতামাতা ধীরে চলেন বলিয়া, নিজের সমান দৌড়াইতে পারেন না বলিয়া যিনি রাগারাগি করেন, তিনি পিতামাতার অনাদর করেন। গোখ্‌লে যদি আমাদের সাথে না দৌড়াইতে পারেন তবে তাহাতে কি হইয়াছে? যিনি স্বরাজ্য ভোগ করিতে চাহেন তিনি নিজেদের মধ্যে যাহারা বড় তাঁহাদিগকে অপমান করেন না। সম্মান করার প্রথা যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমরা কার্য্যের অযোগ্য হইয়া যাইব। যাহারা শ্রেষ্ঠ লোক তাঁহারাই স্বরাজ্য ভোগ করার উপযুক্ত, যাহারা হীন তাঁহারা নহেন। আরো দেখুন, যখন গোখ্‌লে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন সে সময় ঐ রকমের কয়জন লোক ছিলেন? আমার বিশ্বাস যে তিনি যাহা কিছু করেন তাহা মনের শুদ্ধভাব হইতেই করেন এবং হিন্দুস্থানের যাহাতে হিত হয় সেই বিবেচনা করিয়াই করেন। তাঁহার ভিতরে হিন্দুস্থানের জন্য এমনই ভক্তি আছে যে, যখন আবশ্যক হইবে তখন তিনি নিজের প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে পিছাইবেন না। আমি তোষামোদ করিয়া একথা বলিতেছি না, যাহা উচিৎ মনে করি তাহাই বলিতেছি। এই হেতু তাঁহারা যে আমাদের পূজ্য এই ভাবই মনে রাখা চাই।

পাঠক—তাহা হইলে কি তাঁহার সকল কর্ম্মেই আমাদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে?

সম্পাদক—আমি এমন কথা কখনও বলিতে চাই না। আপনি শুদ্ধ শান্ত মনে বিচার করিয়া যাহা ঠিক করেন সেই অনুসারেই চলিবেন। গোখ্‌লেও সেই কথাই বলিবেন। তাঁহার কার্য্যের নিন্দা না করি ইহাই আমাদের দেখিতে হইবে। তাঁহার মত লোককে পূজ্য বলিয়া

মানিতে হইবে। এটা নিশ্চয় মনে রাখা দরকার যে, তাঁহাদের কর্ম্মের তুলনায় আমরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারি নাই। যে সকল কাগজ তাঁহার নিন্দা করে তাহার প্রতিবাদ করা চাই। গোখ্‌লে প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে স্বরাজ্যের দৃঢ় স্তম্ভ বলিয়া মনে করা চাই। তাঁহাদের বিচার মন্দ আর নিজের বিচারটা ভাল, নিজের ইচ্ছামত যে না চলে সে শত্রু—এরূপ মনে করা বড় খারাপ।

পাঠক—এখন আপনার কথা কিছু কিছু বুঝিতেছি। ইহার উপর বিচার করিব। কিন্তু হিউম বা সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতির বিষয়ে আপনার কথার মানে এখনো ঠিক বুঝিতেছি না।

সম্পাদক—উহা ত একই কথা হইল, হিন্দুস্থানীদের বিষয় আমি যাহা বলিয়াছি, ইংরাজদের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আমি সকল ইংরাজকেই খারাপ মনে করি না। হিন্দুস্থানে যাহাতে স্বরাজ্য আসে অনেক ইংরাজ তাহার পক্ষপাতী। এ কথা ঠিক যে—ইংরাজ জাতির মধ্যে স্বার্থের মাত্রা অধিক। কিন্তু তাহা হইতে একথা প্রমাণ হয় না যে, সকল ইংরাজই অধর্ম্মপরায়ণ। যিনি ন্যায় ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অপরের সঙ্গেও ন্যায্য আচরণ করিতে হয়। সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ যে আমাদের অমঙ্গল হউক এমন ইচ্ছা করেন না—ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এ বিষয়ের সম্বন্ধে বিচার আরও শুনিলে আপনার নিকট ইহা পরিষ্কার হইবে যে, আমরা ন্যায়ের উপর যত নির্ভর করিব তত শীঘ্র শীঘ্র হিন্দুস্থান মুক্তিলাভ করিবে। ইংরাজ বলিয়াই যত অধিক শত্রুভাব রাখিব স্বরাজ্য ততই আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবে। আর ন্যায় আচরণ করিতে থাকিলে স্বরাজ্য-লাভ করার কর্ম্মে তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে।

পাঠক—ইংরাজেরা স্বরাজ্য-লাভে সাহায্য করিবে, ইহা বাজে কথা বলিয়া মনে হয়। আমাদের স্বরাজ্য-লাভের সহিত ইহার যোগ-সূত্র কোথায়? ইংরাজের সাহায্য এবং আমাদের স্বরাজ্য লাভ—এ দুই জিনিষ যে একেবারেই বিপরীত বস্তু। কিন্তু এ সব কথা তুলিয়া আমি সময় নষ্ট করিব না। যখন আপনি স্বরাজ্য পাওয়ার উপায় বিচার করিবেন, তখন হয় ত এ বিষয়ে আপনার কথা বুঝিতে পারিব। কথাবার্ত্তার মাঝখানে ইংরাজের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার কথা তুলিয়া আপনি আমাকে ভুল পথে লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং ওকথা এইখানেই শেষ করা ভাল।

সম্পাদক—আমি ইংরাজদের কথা লইয়া বেশী আলোচনা করিতে চাই না—আর আপনাকে ভুল পথে লইবার ইচ্ছাও নাই। তিক্ত ঔষধ প্রথম হইতে খাওয়াইয়া দেওয়াই ভাল। ধীরে ধীরে আপনার ভুল দূর করাই আমার কাজ।

পাঠক—আপনার একথা আমার ঠিক মনে হয়, আর নিজের নিকট যে কথা ঠিক বোধ হয় সে কথা বলিতে সাহসও বাড়ে। আর একটা সন্দেহের কথা রহিয়া গিয়াছে উহাও জিজ্ঞাসা করিব। আপনি বলিতেছেন যে কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে স্বরাজের গোড়া পত্তন হইয়াছে—ইহার মানে কি?

সম্পাদক—দেখুন, কংগ্রেস হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোককে একত্র করিয়া উহাদের মধ্যে স্বরাজ্য-ভাবনা জাগাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসের উপর সরকারের কড়া নজর আছে। কংগ্রেস বরাবরই এই দাবী জানাইয়া আসিয়াছে যে, যাহারা খাজনা দেয়, টাকা কেমন ভাবে ব্যয় হইবে তাহা বলিয়া দেওয়ার অধিকারও সেই প্রজার আছে।

ঐ অধিকার পাওয়া যাইবে কিনা, উহা উচিত কি অনুচিত, উহা অপেক্ষা আরও ভাল কিছু আছে কিনা, সে কথা আলাদা। আসল কথা হইতেছে এই যে, কংগ্রেস দেশের লোককে স্বরাজ্যের আস্বাদ দিয়াছে। কংগ্রেসের এই কার্য্যের জন্য বাহাদুরী অপর কাহারও লওয়া কেবল অন্যায় নয়, উহা কৃতঘ্নতা। তাছাড়া ঐ রকম মনের ভাব থাকিলে আমাদের কাজ সফল হওয়ার পথে বাধা আইসে। কংগ্রেসকে যদি আমরা স্বরাজ্যের পথে বাধা মনে করি, তাহা হইলে কংগ্রেসের ভিতর দিয়া কাজও আদায় করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গ-ভঙ্গ

পাঠক—আপনার কথায় ইহাই বোধ হয় যে, কংগ্রেসই স্বরাজের জন্য লোককে ভাবিতে শিখাইয়াছে। কিন্তু একথাও ত আপনাকে মানিতে হইবে যে, উহা সত্যকার জাগরণ নহে। তাহা হইলে সত্যকার জাগরণ কখন ও কেমন করিয়া হইয়াছে সেই কথা বলুন।

সম্পাদক—বীজ ত সর্ব্বদা চোখে দেখা যায় না—মাটীর নীচে থাকিয়াই ভিতরে ভিতরে নিজের কার্য্য করিয়া শেষে মাটির সহিত মিশিয়া যায়। উহার প্রভাবে মাটির নীচ হইতে বড় গাছ গজাইয়া উঠে। কংগ্রেসকেও এই রকম জানিবেন। যাহাকে আপনি সত্যকার জাগরণ বলেন উহা বঙ্গ-ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ জন্য লর্ড কার্জ্জনকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বাংলা দেশ দুই টুকরা করা হইলে বাঙ্গালীরা

কার্জ্জন সাহেবের অনেক হাতেপায়ে ধরাধরি করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব বাহাদুর নিজেকে রাজা বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার করিয়া সে কথায় কান দিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ইহারা ত হিন্দুস্থানী, বকাবকি করিয়াই থামিয়া যাইবে—ইহারা আর করিবে কি? অত্যন্ত অহঙ্কার ও অত্যন্ত অপমানের সহিত বঙ্গ-ভঙ্গের কথা নাদীরশাহী চালে শুনাইয়া দিলেন। একথা জানিবেন যে, সেই দিন হইতেই ইংরাজের রাজ্য দুই টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ-ভঙ্গ দ্বারাই ইংরাজ রাজত্ব সব চেয়ে বড় ধাক্কা খাইয়াছে। একথা মনে করিবেন না যে, বঙ্গ-ভঙ্গ করিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছিল—কিম্বা মনে করিবেন না যে, লবণের উপর টেক্সের ন্যায় একটা সাধারণ অন্যায় তখন ছিল না। এসব কথার আলোচনা পরে করিব। কিন্তু একথা ঠিক যে বঙ্গ-ভঙ্গ লইয়াই সবচেয়ে বেশী বিরুদ্ধতা করিবার জন্য জন-সাধারণ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের হৃদয় শক্তিতে পূর্ণ ছিল। বাংলার অনেক নেতা নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল। সেই যে শক্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে সে আগুন আর নিভিবে না। বঙ্গ-ভঙ্গ ত রদ হইয়া যাইবেই—বাংলা আবার এক ত হইবেই * কিন্তু ইংরাজের জাহাজে যে ছিদ্র হইয়াছে তাহা আর বন্ধ হইবে না। ঐ ছিদ্র দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। হিন্দুস্থান একবার যে জাগিয়াছে আবার তাহার ঘুমাইয়া পড়া অসম্ভব। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার আন্দোলন স্বরাজ্যের আন্দোলন। বাংলার নেতারা একথা খুব বোঝেন। ইংরাজ হাকিমদের নিকটও একথা গোপন নাই। আর সেইজন্য বঙ্গ-ভঙ্গ রদ এতদিন হয় নাই। দিনে দিনে রাজনৈতিক ব্যাপারে

* ১৯০৮ সালে একথা লেখা হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে এই কথা যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়—বাংলা আবার জোড়া লাগে।

আমাদের শক্তি বাড়িতেছে। এই কাজ একদিনের নয়, অনেক বৎসর লাগে।

পাঠক—আপনার মতে বঙ্গ-ভঙ্গের ফল কি হইয়াছে?

সম্পাদক—এতদিন লোক মনে করিত যে, রাজার নিকট দরখাস্ত আর প্রার্থনা করিতে হইবে, সে কথা যদি তিনি না শোনেন, দুঃখ দূর না করেন, তবে দুর্ভাগ্য মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি তাহাতে মন না মানে তবে পুনরায় প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে একথা আমাদিগকে বুঝাইয়াছে যে, চাওয়ার পিছনে কোনও বল থাকা দরকার, আত্মবলি দিবার, প্রাণ দিবার জন্য তৈয়ার থাকিতে হয়। এই নূতন চিন্তার ধারা হইতেছে বঙ্গভঙ্গের প্রধান ফল। ইহার লক্ষণ সংবাদপত্রে প্রকট হইতে লাগিল। লোকের লেখায় কড়া ভাব আসিতে লাগিল। যে কথা গোপনে আর ভয়ে ভয়ে বলা হইত, খোলা মাঠে প্রকাশ্যে সেই কথা শোনান হইতে লাগিল। স্বদেশীর আন্দোলন সুরু হইল। ছোট বড় ইংরাজ দেখিয়া ডরান আর কাঁপুনি বন্ধ হইল। উহাদিগকে মারপিট পর্য্যন্ত করার সাহস দেখা দিল। জেলের ভয় ভাঙ্গিল। ভারত-মাতার অনেক সুসন্তান আজিও দেশ হইতে বহিস্কৃত হইয়া আছেন। ইহাত দরখাস্ত আর বিনয় প্রকাশ করা নয়। এখনকার আন্দোলন জোরের উপর দাঁড়াইয়া আছে। বাংলার এই বাতাস উত্তরে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আর দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বহিয়া গেল।

পাঠক—ইহা ছাড়া আর কি কি বিশেষ ফল আপনি দেখিতেছেন?

সম্পাদক—বঙ্গভঙ্গে যেমন ইংরাজের জাহাজে ছিদ্র হয়, তেমনি আবার আমাদেরও এক হানি হয়। সে কার্য্যের পরিণামও বিষম

বলিতে হইবে। আমাদের নেতাদের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল। এক মডারেট, অপর একস্ট্রীমিষ্ট। আমাদের কথায় আমরা নরম ও গরম দল বলিয়া থাকি। কেহ কেহ মডারেটকে ভীরু আর একস্ট্রীমিষ্টকে সাহসী বলিয়া থাকেন। যাঁহার যেমন বিচার তিনি সেই রকম অর্থ করিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, একথা ঠিক যে এই দুই দল হওয়াতে বিষই উৎপন্ন হইয়াছে। একপক্ষ অপরকে বিশ্বাসঘাতক মনে করেন, আর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেও দ্বিধা করেন না। সুরাট কংগ্রেসের সময় প্রায় মারপিট পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার মত, এরূপ ভাগের দ্বারা দেশের লাভ হয় না। এই রকম দল বেশী দিন থাকিবেও না, তবে কতদিন থাকিবে সে কথা বলা কঠিন।

তৃতীয় অধ্যায়

অশান্তি ও অসন্তোষ

পাঠক—আপনি বঙ্গ-ভঙ্গকে জাগরণের কারণ বলিলেন, কিন্তু উহা হইতে যে অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা আপনি ভাল না মন্দ বলেন ?

সম্পাদক—কেউ যখন ঘুম হইতে উঠে তখন যেমন আলস্যে গা-মোড়া দেয়, একটু অস্বস্তি বোধ করে, পুরা জ্ঞান হইতে সময় লাগে, তেমনি বঙ্গ-ভঙ্গে জাগরণ যদিও হইয়াছে তবু পুরা জাগ্রতি আসে নাই। এখনো একটা অসোয়াস্তির অবস্থায় আমরা আছি। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থাটাকেও যেমন আবশ্যকীয় অবস্থা বলা যায়,

তেমনি বাংলার আর বাংলা হইতে সমস্ত হিন্দুস্থানে যে অশান্তি আসিয়াছে তাহাও স্বাভাবিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। আমাদের মনে যে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে উহা হইতেই শান্তিপূর্ণ সময় আসিতে পারে। জাগিয়া উঠিলে কেহ বরাবরই গা-মোড়া দিতে থাকে না, তেমনি এই অশান্তিও অবশ্যই আমাদের দূর হইবে। অশান্তি কাহারও ভাল লাগে না।

পাঠক—কিরূপ অশান্তি আপনি দেখিতেছেন?

সম্পাদক—আসল অশান্তি হইতেছে অসন্তোষ। আজকাল ঐ অসন্তোষকে আমরা অশান্তি বলিয়া থাকি। হিউম সাহেব হিন্দুস্থানে অসন্তোষ আসা চাই কেবল এই কথার উপর জোর দিতেন। অসন্তোষ দ্বারা খুব কাজ হয়। যে ব্যক্তি নিজের দশায় সন্তুষ্ট, তাহাকে সেই অবস্থা হইতে বাহির হইতে রাজি করা শক্ত। সেই জন্য প্রত্যেক পরি-বর্ত্তনের পূর্ব্বেই অসন্তোষ আবশ্যক হয়। যাহা বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে মন যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখন সেই বাঁধন ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা হয়। হিন্দুস্থানের যাহারা বড় আর ইংরাজদের মধ্যে যাহারা ভাল তাঁহারাই আমাদিগকে এই অসন্তোষের পাঠ শিক্ষা দিয়াছেন। অসন্তোষ দ্বারা অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে, উহাতে কত লোক পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, আঘাত পাইয়াছে, জেলে পচিতেছে, অথবা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এখনো আরো কিছু বাকী আছে। এই অশান্তি মঙ্গলের চিহ্ন, কিন্তু তাহা খারাপ ফলও প্রসব করে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বরাজ্য কি?

পাঠক—এতক্ষণে ইহা বুঝিয়াছি যে, হিন্দুস্থানে ঐক্য আনিতে কংগ্রেস কি করিয়াছেন, বঙ্গভঙ্গ দ্বারা কি রকমে জাগরণ আসিল, অশান্তি আর অসন্তোষ কেমন করিয়া দেশে ছড়াইতেছে। এক্ষণে স্বরাজ্য সম্বন্ধে আপনার মত কি জানিতে চাই। এই বিষয়ে আপনার সহিত আমার মত ভিন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে।

সম্পাদক—মতের তফাৎ ত হইতেই পারে। স্বরাজ্যের জন্য আমরা সকলেই ত আগ্রহ করিয়া আছি, কিন্তু এখনো স্থির করা হয় নাই যে, স্বরাজ্য কি? অনেকে মনে করেন, ইংরাজকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার নামই স্বরাজ্য। কিন্তু মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা হয় নাই। আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি যে, যদি আমরা যাহা চাই, ধরা যাক্, ইংরাজেরা তাহাই দিল, তবুও কি ইংরাজ-দিগকে বাহির হইয়া যাইতে হইবে?

পাঠক—আমি ইংরাজদিগকে একটা কথাই বলিব যে, দয়া করিয়া আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। এই ইচ্ছা যদি উহারা পূর্ণ করে এবং আর কেহ যদি এই কথায় অন্য রকম মানে করিয়া লয় যে, ইংরাজেরা গিয়াও যায় নাই, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি হইবে না। আমি এই কথা বুঝিয়া লইব যে, আমাদের কথায় চলিয়া যাওয়া মানে কেবল থাকিয়া যাওয়া মাত্রও হইতে পারে।

সম্পাদক—আচ্ছা ধরিয়া নিন, ইংরাজ রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিল তাহা হইলে কি করিবেন ?

পাঠক—এ কথার কি জবাব দিব ? এ কথার জবাব তখনই দেওয়া যাইবে যখন উহাদের রাজকার্য্য ছাড়ার ধরণটা দেখিব। আপনি যেমন বলিতেছেন তদনুসারে যদি ধরিয়া লই যে, উহারা চলিয়া গেল, তখন আমরা উহাদের মত ধরণ-ধারণ ঠিক রাখিব, আর রাজ্যের কার্য্য চালাইব। আর যদি উহারা যেমন আছে তেমনি সিধা চলিয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের সৈন্য-সামন্ত ত সবই থাকিবে, ইহাতে রাজকার্য্যে বাধা কিছু হইবে না।

সম্পাদক—আপনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা বলিলেন। কিন্তু আমি ওরকম বুঝি না। যাহা হোক্ এখন এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিব না। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হইবে। আপনার নিকট আরও দুই একটি প্রশ্ন করিয়া এই কার্য্য সহজ করিয়া লইব। আপনি ইংরাজদিগকে বাহির করিয়া দিতে চাহেন কেন ?

পাঠক—ইংরাজ রাজত্ব করার জন্য দেশ গরীব হইয়া যাইতেছে ইহাই কারণ। তাহারা প্রতিদিনই এ দেশ হইতে ধন লইয়া যাইতেছে। সাদা চামড়াওয়ালাদিগকে তাহারা ভাল পদ দিয়া থাকে। আমাদিগকে কেবল গোলাম করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, দায়িত্বহীন ব্যবহার করিতেছে।

সম্পাদক—যদি উহারা দেশের সম্পদ লইয়া যাওয়া বন্ধ করে, জবরদস্তী না করে, আমাদিগকে উচ্চ পদ দেয়, তাহা হইলে উহাদের থাকিতে কোনও দোষ আছে বলিয়া কি আপনি মনে করেন ?

পাঠক—এ কেবল বাজে আলোচনা। বাঘ যদি তাহার নিজের স্বভাব বদলায় তবে তাহার সহিত মেলামেশা করিতে হানি কি, জিজ্ঞাসা

করাও যেমন আপনার কথাও তেমনি। বাঘ যদি নিজের ব্যবহার বদলাইতে পারে তাহা হইলে ইংরেজরাও পারে। ইহা দ্বারা যাহা অসম্ভব তাহাই সম্ভব মনে করা হইবে।

সম্পাদক—আচ্ছা ক্যানাডা বা বুয়রদিগের মত রাজ্যাধিকার যদি পাওয়া যায় ?

পাঠক—ইহাও অকেজো প্রশ্ন। আমাদের কাছে যদি উহাদের মত গোলা-বারুদ থাকিত তবেই ওরূপ হইতে পারিত। ঐ রকম অধিকার পাইলে ত আমরা নিজেদের নিশানই উড়াইব। হিন্দুস্থানের ও জাপানের অবস্থা এক রকম হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ত আমাদের নিজেদের ফৌজ পল্টন, জাহাজের বহর, হাঁক ডাক সব জিনিষই হইয়া যাইবে। তাহা হইলে পৃথিবী মধ্যে হিন্দুস্থান সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বেড়াইবে।

সম্পাদক—আপনি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহার মানে ত এই যে, আপনার ইংরেজী রাজ্য চাই, ইংরেজ চাই না। বাঘের স্বভাব চাহেন, বাঘটাকে চাহেন না। আপনি হিন্দুস্থানকে ইংরাজী বানাইতে চাহেন। কিন্তু তাহা হইলে উহা হিন্দুস্থান থাকিবে না, ইংলিস্থান হইবে। আমার এমন ধারা স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা নাই।

পাঠক—আমি যেমন বুঝি স্বরাজের সেই রকম রূপ বর্ণনা করিয়াছি। আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহার অর্থ যদি কিছু থাকে, স্পেনসর, মিল ইত্যাদির ও মার্কের লেখার যদি কোনও অর্থ থাকে, আর ইংরাজের পার্লামেণ্ট সকল পার্লামেণ্টের মাতৃস্বরূপা একথা যদি ঠিক হয়, তবে ত আমার মতে অবশ্যই ইংরাজের নকল করা চাই ; আর এতটা নকল করা চাই যে, ওরা যেমন নিজের দেশে আর কাহাকেও ঢুকিতে দেয় না তেমনি আমরাও যেন কাহাকেও ঢুকিতে না দেই। উহারা

নিজের দেশের যেমন অবস্থা করিয়াছে তেমন ত আর কোথাও দেখিতে পাই না। এই জন্য উহাদের অনুকরণ ত আমাদিগকে করিতেই হইবে। যাহা হউক আপনি আপনার বিচার প্রকাশ করুন।

সম্পাদক—এখনো দেরী আছে। এই চর্চ্চার মধ্য দিয়াই আমার মত প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। স্বরাজের রূপ আপনি যেমন সহজ মনে করিয়াছেন আমি তেমনি কঠিন মনে করি। এই জন্য এখন আপনাকে কেবল এই টুকুই বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, আপনি যাহাকে স্বরাজ্য বলেন আসলে উহা স্বরাজ্য নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইংলণ্ডের অবস্থা

পাঠক—আপনার কথায় জানিতে পারিতেছি যে, ইংলণ্ড যে রাজ্যভোগ করিতেছে উহা ঠিক নহে, আর ঐ রকম রাজত্ব লওয়া আমাদেরও উচিত নয়।

সম্পাদক—আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আজ কাল যে অবস্থা তাহা দেখিয়া, সত্য বলিতে কি, দয়া হয়। আর আমি ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন হিন্দুস্থানের ঐ অবস্থা কখনো না হয়। যে পার্লামেণ্টকে আপনি 'মা' বলিতেছেন উহা ত বন্ধ্যা ও বেশ্যা। কথা দুইটা কড়া হইলেও উহার মানে একেবারেই ঠিক। বন্ধ্যা এই হিসাবে বলা যায় যে; আজ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট আপনা হইতে কোনও কাজ করে নাই। উহার স্বভাবই এমন যে, বাহিরের

চাপ না পড়িলে কোন কাজই করিতে পারে না। আর 'বেশ্যা' বলার অর্থ এই যে, উহাকে পরিবর্ত্তনশীল মন্ত্রীমণ্ডল ইচ্ছানুসারে নিজের হাতের ভিতর রাখে। আজ যদি উহার ধুরন্ধর এস্‌কুইথ হয়, তবে কাল ব্যালফোর ও পরশু আর কেহ।

পাঠক—আপনি ব্যঙ্গ করিয়াই এরূপ বলিতেছেন। বন্ধ্যা কেন বলিলেন সে কথা এখনো প্রমাণ করেন নাই। পার্লামেণ্ট জনসাধারণের দ্বারা গড়া। সেই জন্য সাধারণ লোকের চাপেই কাজ করে, উহার উপর লোকের যে অধিকার আছে তাহাইত উহার গুণ।

সম্পাদক—সম্পূর্ণ ভুল বিচার। পার্লামেণ্ট যদি বন্ধ্যাই না হইত তাহা হইলে লোকে বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লোকই উহাতে পাঠাইত। পার্লামেণ্টের সভ্যগণ বেতন না লইয়া কাজ করিয়া থাকেন; সেই জন্য লোকের হিতের জন্যই পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা উচিত। যাহারা পার্লামেণ্টের সভ্য তাঁহারা লেখাপড়া-জানা লোক, সেই জন্য আমাদের ধরিয়া লওয়া উচিত যে, তাঁহারা ভুল করিতেছেন না। এই রকম যে পার্লামেণ্ট তাহাতে প্রবেশের জন্য প্রার্থনা পত্র আবশ্যক হয় না, এবং তাহাকে ঠিক রাখিবার জন্য চাপ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। এই রকম পার্লামেণ্টের কাজ এমন হওয়া চাই যে, দিন দিন উহার শক্তি বর্দ্ধিত হয় ও লোকের উপর উহার প্রভাব বাড়ে। কিন্তু এইরূপ না হইয়া কার্য্যতঃ কি হয়? সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে, পার্লামেণ্টের মেম্বর কপটাচারী ও স্বার্থপর। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ-পূরণের চেষ্টাই করিয়া থাকে। পার্লামেণ্ট কেবল মাত্র ভয়েই যা কিছু কাজ করে। আজ যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে কাল তাহা রদ করিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টে এমন কোন কাজই করিতে পারে নাই যাহাতে বলা যায় যে, সে উক্ত কাজের শেষ অবধি পহুঁছিতে

পারিয়াছে। বড় বড় বিষয় আলোচনার সময় কোন কোন সদস্য ঘুমাইয়া পড়ে, কখনও বা বসিয়া বসিয়া ঝিমায়। আবার কখনও বা এমন সোরগোল করে যে, যাহারা শুনিতে চায় তাহাদের আর বসিয়া শুনিবার সাহস থাকে না।

পার্লামেণ্টকে একজন ইংরাজ "ব্যর্থতাবাদী" বলিয়াছেন। পার্লামেণ্টে যে যে-পক্ষের সদস্য সেই পক্ষে চক্ষু বুঁজিয়া মত দিয়া থাকে এবং ঐরকম মত দিতে তাহাকে বাধ্যও করা হয়। পার্লামেণ্টে কোনও সদস্য যদি নিজের দলের সহিত ভোট না দেন তবে তাঁহাকে বেকুব বলিয়া ধরা হয়। যে সময় ও অর্থ পার্লামেণ্ট হইতে নষ্ট করা হয় ঐ সময় ও অর্থ অল্প কয়েকজন কাজের লোকের হাতে পড়িলে প্রজার উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে। পার্লামেণ্ট ত প্রজার পক্ষে এক রকম আতস বাজীর তামাসার সামিল। এই তামাসায় প্রজার ধন বে-হিসাবে উড়াইয়া দেওয়া হয়। এ সব আমার মনগড়া কথা মনে করিবেন না। বড় বড় বুদ্ধিমান ইংরাজেরাও এইরূপ বলেন। একজন সদস্য ত এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, পার্লামেণ্ট ধার্ম্মিক লোকের যোগ্য নয়। অপর একজন বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট একটী অসহায় খোকা। কিন্তু খোকা কি চিরকালই খোকা থাকিয়া যায়? আজ সাতশত বৎসর পরেও যদি পার্লামেণ্ট খোকাই রহিয়া গিয়াছে, তবে বড় না জানি কবে হইবে?

পাঠক—আপনি আমাকে বিপদে ফেলিয়া দিলেন। আশা করি, আপনি আমাকে আপনার সব কথাই একেবারে মানিয়া লইতে বলিবেন না। আপনি আমার মনে এক সম্পূর্ণ নূতন ভাব আনিয়া দিলেন। ঐ ভাব আমাকে পরিপাক করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন 'বেশ্যা' শব্দটী কেন ব্যবহার করিলেন।

সম্পাদক—আমি একথা স্বীকার করি যে, আমি যাহা বলিয়াছি আপনি সে সকলই মানিয়া লইতে পারেন না। সময় পাইলে যদি কখনও আপনি ঐ বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা পড়েন তবে কিছু বুঝিবেন। পার্লামেণ্টকে বেশ্যা পদবী মিছামিছি দেওয়া হয় নাই। উহার সত্যকার মালিক বলিয়া কেহ নাই। কোনও এক মালিক ত হইতেই পারে না। কিন্তু আমি কেবল এই টুকুই বলিতে চাই না যে, উহার কোনও এক মালিক নাই। প্রধান মন্ত্রীকে উহার মালিক ধরিলেও উহার চালচলন এক ধরণের থাকে না। পার্লামেণ্টের ভাগ্যে বেশ্যার দুর্গতি সব সময়ই লাগিয়া আছে। পার্লামেণ্টের জন্য প্রধান মন্ত্রীর উদ্বেগ কমই থাকে। মন্ত্রী আপন প্রভুত্বের নেশায় চুর হইয়া থাকেন। তিনি সব সময়ই নিজের পক্ষ যাহাতে জয়ী হয় সেই চেষ্টাই করেন। পার্লামেণ্ট যাহাতে উচিত কাজ করে সে দিক তাঁহার খুব কমই খেয়াল থাকে। প্রধান মন্ত্রী নিজ দল মজবুত রাখিবার জন্য পার্লামেণ্ট হইতে কোন কোন কার্য্য করাইয়া লন। ইহার উদাহরণ যত ইচ্ছা দেওয়া যায়। এই বিষয়টী বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

পাঠক—যাঁহাদিগকে আমরা আজ পর্য্যন্ত দেশভক্ত ও খাঁটি লোক বলিয়া মানিতাম, আপনি ত তাঁহাদের উপরই আক্রমণ করিতেছেন।

সম্পাদক—হাঁ, সে কথা ঠিক। প্রধান মন্ত্রীর সহিত আমার কোনও শত্রুতা নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, তাঁহাকে খাঁটি দেশভক্ত বলা যায় না। ঠিক যাহাকে ঘুষ বলে সে জিনিষটার লেন-দেন তিনি করেন না, সে জন্য ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে খাঁটি

লোক বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিকট সুপারিশের মূল্য আছে। অপরের নিকট হইতে কার্য্য লইবার জন্য তিনি উপাধি ইত্যাদি নানা রকম ঘুষ দিয়া থাকেন। আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, তাঁহাদের আচরণে খাঁটি পবিত্রতা বা সত্যকার সততা নাই।

পাঠক—আপনার মত যদি পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে এই প্রকার হয় তাহা হইলে যে ইংরেজদিগের নামে পার্লামেণ্ট রাজত্ব করে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন। তাহাতে উহাদের স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ রূপ আমি বুঝিতে পারিব।

সম্পাদক—ইংরাজ ভোটারদিগের নিকট আজকাল ত সংবাদ পত্রই হইতেছে বেদশাস্ত্র। খবরের কাগজ দেখিয়াই উহারা নিজের মত স্থির করে। কিন্তু খবরের কাগজের কথার ত কোনই মূল্য নাই; কেন না কাগজ নিজেই অসদাচারী। একই জিনিষ খবরের কাগজে দুই রকম রূপে দেখা দেয়। একদল উহাকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তোলে, অপর দল উহাকেই সরিষা প্রমাণ দেখে। এক খবরের কাগজ এক নেতাকে যদি ভাল বলে, অপর কাগজ তাহাকে, মন্দ বলিবে। এমন খবরের কাগজ যে দেশে, সে দেশের দুর্দ্দশার শেষ কোথায়?

পাঠক—আপনিই বলুন।

সম্পাদক—উহারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিজের মত বদলায়। ইংরাজদের ভিতর একটা কথা চলিত আছে যে, সাত বৎসর পর পর উহাদের রং বদলাইয়া যায়। ঘড়ির লকেটের ন্যায় উহারা এদিক সেদিক দুলিতে থাকে; কোনও এক নিশ্চয়তার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। কেহ যদি ছলা-কলা করিয়া বড় বড় কিছু কথা

তৈয়ারী করিতে পারে, উহাদিগকে তোয়াজ করিতে পারে, তাহা হইলে ভাটের মত তাহারই গুণগান আরম্ভ করিয়া দেয়। আর পার্লামেণ্টও ঠিক ঠিক এমনিতর। কিন্তু ইহাদের ভিতর একটা জিনিষ বড় ঠিক আছে; ইহারা নিজের দেশকে আর কাহারও হাতে যাইতে দিবে না। ওদিকে কেহ চোখ দিলে চোখ কানা করিয়া দিবে। কিন্তু ইহাতেই এমন কথাও বলা যায় না যে, ইংরেজদের ভিতর সমস্তই গুণ। আর সেই জন্য উহাদের নকল করা চাই। আমার বিশ্বাস যে হিন্দুস্থান যদি ইংরাজদের নকল করে তবে সে সত্য সত্যই ধ্বংস হইবে।

পাঠক—ইংরাজদের এমন নীচু হইয়া যাওয়ার হেতু আপনি কি মনে করেন?

সম্পাদক—ইহাতে ইংরাজের বেশী দোষ নাই। উহাদের সভ্যতা কেবল উহাদের কেন, সারা ইউরোপের সভ্যতাই, ইহার জন্য দায়ী। উহাকে সভ্যতা না বলিয়া অসভ্যতা বলা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সভ্যতা

পাঠক—এখন আপনাকে সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। আপনিত সভ্যতাকেই অসভ্যতা বলিয়া মনে করিতেছেন।

সম্পাদক—কেবল আমি নহি অনেক ইংরেজ লেখকও ঐ সভ্যতাকে অসভ্যতা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে কয়েক খানা পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইংরাজদের ভিতরেও এই সভ্যতার বিরোধী দল গঠিত হইতেছে।

একজন লেখক একখানা বই লিখিয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন "সভ্যতা-রোগের কারণ ও উহার ঔষধ"। ঐ পুস্তকে সভ্যতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পাঠক—এসকল সংবাদ ত কই আমরা পাই না।

সম্পাদক—ইহার কারণ ত সহজেই বোঝা যায়। কে নিজের কথার উল্টা প্রমাণ করিতে চায়? যাঁহারা এই সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া আছেন তাঁহাদিগকে এই সভ্যতার সমর্থনের জন্যই সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে দেখা যায়, এই সভ্যতার বিরোধী প্রমাণ তাঁহারা প্রচার করেন না। তাঁহারা যে জানিয়া বুঝিয়া এমন করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারেই ঐ কাজ করেন। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নকেই সত্য মনে হয়, চোখ খুলিলে তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারা যায়। সভ্যতার বিপাকে পড়িলে মানুষেরও ঐ দশা হয়। আমরা সকল সময়েই এই সভ্যতার প্রশংসার কথা পড়িতেছি। বড় বড় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষও ইহার প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহাদের লেখা পড়িয়া আমরা মোহিত হই। এমনি করিয়া একে অন্যেকে এই সভ্যতার মোহে ফেলিতেছে।

পাঠক—আপনার কথা ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। এই সভ্যতা সম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু পড়াশুনা করিয়াছেন তাহা বলিতে থাকুন।

সম্পাদক—প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, সভ্যতা শব্দ দ্বারা কোন অবস্থা ও কি ব্যাপার বুঝা যায়। আধুনিক সভ্যতার সব চেয়ে খাঁটি পরিচয় এই যে, যাঁহারা নিজেদিগকে সভ্য বলেন, তাঁহারা নিজেদের শরীরের সুখকে, আয়েস-আরামকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। এক বৎসর পূর্ব্বে ফিরিঙ্গীরা যেরূপ বাড়ী ঘরে থাকিত এখন তাহা অপেক্ষা ভাল বাড়ী ঘরে থাকেন। ইহাই সভ্যতার লক্ষণ

বলিয়া মানা হয়, আর ইহাতে শারীরিক সুখের বৃদ্ধিও আছে। আগেকার লোকেরা জানোয়ারের চামড়া পরিতেন ও বল্লম সড়কী চালাইতেন। এখন লম্বা পাজামা পড়া হয়, নানারকমের পরিচ্ছদ দিয়া দেহ আবরণ করা হয়, আর ভল্ল সড়কীর বদলে দোনালা বন্দুক চালান হয়। কোনও দেশের লোক, যাহারা পূর্ব্বে ফিরিঙ্গীদের মত কোট বুট পরে নাই, আজ যদি তাহারা কোট বুট পরিতে আরম্ভ করে, তবে একথা বলা হয় যে, পূর্ব্বে তাহারা জঙ্গলী ছিল, আজ সভ্য হইয়া গিয়াছে। আগেকার ফিরিঙ্গীরা নিজ হাতেই কার্য্য করিত ও ক্ষেতের চাষে নিজের শরীর খাটাইত। আজ ইঞ্জিনের সাহায্যে একশ বিঘা জমি একজন লোকের দ্বারাই চাষ হইতেছে, আর ঐ উপায়ে অনেক টাকা রোজগার করিয়া লইতেছে। ইহাই সভ্যতার চিহ্ন। আগেকার কালে অল্প লোকেই পুঁথি লিখিতেন—এ পুঁথি খুবই দরকারী জিনিষ হইত। আজ যাহার ইচ্ছা পুঁথি লিখিয়া ছাপাইয়া লইতেছে, যাহা খুসী তাহাই লিখিতেছে, আর যেমন খুসী লোকের মন বিগড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে লোক গরুর গাড়ীতে যাতায়াত করিত, আজ সেইখানে রেলে চড়িয়া এক দিনে রাতে দুইশত ক্রোশ ঘুরিয়া আসিতেছে। ইহাই সভ্যতার বড় উচ্চ অঙ্গ বলিয়া রটনা করা হয়। এমন কথাও বলা হয় যে, ক্রমে ক্রমে এরূপ দিনও আসিবে যখন আকাশ পথে সওয়ার হইয়া দুই চার ঘণ্টায় যে কোনও দেশে পৌঁছান যাইবে, লোকের হাত পা চালাইবার দরকার হইবে না। একটা বোতাম টিপিলেই কাপড় কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে, আর একটা ঘণ্টা টিপিলেই নূতন খবরের কাগজ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, আর একটা বোতাম টিপিলেই মোটরগাড়ী আসিয়া হাজির হইবে—

বেড়াইতে বাহির হইয়া যাওয়া চলিবে, আঙ্গুল স্পর্শ মাত্রই ছাপান্ন প্রকারের ষড়্‌রসযুক্ত ব্যঞ্জন পায়স হইয়া সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কলের অনুগ্রহে ছোট বড় সকল কাজই সহজ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে লোকে যখন একে অন্যের সহিত যুদ্ধ করিত তখন হাতাহাতি যুদ্ধ হইত। আজ পাহাড়ের আড়ালে তোপের পিছনে থাকিয়া একজন মাত্র লোক পলকের মধ্যেই হাজার লোকের প্রাণ নাশ করিতে পারে। ইহারই নাম সভ্যতা। আগে লোকেরা খোলা মাঠে যতক্ষণ ইচ্ছা মজুরি করিত। এখন হাজার হাজার লোক পেটের জন্য দিনরাত কল কারখানায়, খনিতে গহ্বরে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে। উহাদের অবস্থা পশু হইতেও হীন হইয়া গিয়াছে। হাতের মুঠায় প্রাণ লইয়া বিপজ্জনক কার্য্যে উহাদিগকে পিষ্ট হইয়া থাকিতে হয়; ক্রোড়পতির টাকা আরো বেশী সঞ্চয় হয়। আগে লোকেরা মারপিট করিয়া, জবরদস্তী করিয়া দাস বানাইত। আর এখন লোকে নিজে নিজেই শিকল পরিয়া লয়। এ সকলি কেবল ধনের লোভে করে, অথবা ধন দ্বারা ক্রয় করা যায় এমন আয়েস আরামের লোভে করে। আজকাল মানুষের এমন সব রোগ দেখা দিয়াছে যাহার নাম স্বপ্নেও জানা ছিল না। ঐ রোগ প্রতিকারের জন্য ডাক্তারের দল তৈরী হইয়া উঠিয়াছে ও হাসপাতালও বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাও সভ্যতার এক পরিচয়। আগে চিঠি পাঠাইতে নিজের লোক বা হরকরা রাখিতে হইত, তাহাতে অনেক খরচ হইত। আর আজ এক পয়সার কার্ডে ঘরে বসিয়া শত শত ক্রোশ দূরের আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাঠানো যায়, যাহাকে ইচ্ছা গালি দেওয়া যায় ও আশীর্ব্বাদও করা যায়। আগেকার লোকেরা হাতের তৈয়ারী রুটি ও শাক দিনে দুই তিনবার খাইত। এখন ত

লোকের দুই ঘণ্টা পরে কিছু না কিছু খাওয়া চাই। সুতরাং অন্য কার্য্যের আর অবকাশ থাকে কোথায়? বেশী আর কি বলিব! এ সমস্ত কথাই আপনি এমন কোনো কোনো পুঁথিতেও লিখিত দেখিতে পাইবেন যাহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। বস্তুতঃ, ইহাই সভ্যতার সত্যকার পরিচয়। যদি কেহ এ সত্য অস্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে অজ্ঞান, অশিক্ষিত বলিয়াই মনে করা হয়।

এই সভ্যতা ধর্ম্মের বিচার করে না, নীতি মানে না। ইহার উপাসকেরা এই কথাই বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কার্য্য নহে। কোনও কোনও লোক ত ধর্ম্মকে একটা ঢং বা কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন, আবার অনেকে ধর্ম্মের ভেক লইয়া বসিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা নীতি সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা একান্তই অসার। বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার নিকট এই কথাই স্পষ্ট হইয়াছে যে, নীতির নামে লোককে দুর্নীতিই শিখানো হইয়া থাকে। একটা ছোট ছেলেও একথা বুঝিতে পারে যে, আধুনিক সভ্যতার সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাতে উহার সহিত নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। সভ্যতা শরীরের সুখ বাড়াইতে চায়, তাহার জন্যই পরিশ্রম করে, কিন্তু কই সুখ ত বাড়াইতে পারে না।

এই সভ্যতা অধর্ম্ম। কিন্তু ইহাই ফিরিঙ্গীদিগের মন এমন ভাবে অধিকার করিয়াছে যে, উহারা ভূতগ্রস্তের ন্যায় ইহার পিছনে ছুটিতেছে। শরীরে সত্যিকার বল নাই, হৃদয়ে সত্যিকার সাহস নাই। উহার সকল জোর নেশার সাহায্যে পাওয়া। নির্জ্জনে থাকিয়া এই সভ্যতার সুখ পাওয়া যাইবে না। যে নারীকে ঘরের রাণী করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, সেই নারী আজ গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, অথবা কারখানায় কঠিন পরিশ্রম করিতেছে। এক ইংলণ্ডে শুক্‌না রুটির

জন্য ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক কারখানায় বা অমনি আর কোনও স্থানে নোংরা কার্য্য লইয়া কষ্টে কাল কাটাইতেছে। ওখানে যে নারীদের অধিকারের জন্য আন্দোলনের দিন আসিতেছে, এই ভয়ঙ্কর অবস্থা তাহারও কারণ।

এই সভ্যতা এমন যে, যদি নীরবে ধৈর্য্যের সহিত আমরা ইহাকে দেখিতে থাকি তবে দেখিতে পাইব যে, এই সভ্যতার আগুন যাহারা জ্বালাইয়া রাখিতেছে পরিণামে তাহারাই পুড়িয়া মরিবে। মহম্মদ পয়গম্বরের শিক্ষা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই সভ্যতার রাজ্যকে সয়তানী রাজ্য বলিতে হয়। হিন্দুধর্ম্ম ইহাকেই ঘোর কলিকাল বলিয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার ঠিক চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না, ইহা আমার শক্তির অতীত। কেবল আপনাকে এই কথা জানাইয়া দিতে চাই যে, এই সভ্যতাতেই ইংরাজ-রাষ্ট্র পাগল হইয়া আছে। এই সভ্যতা নিজকেও ধ্বংস করে, অপরকেও ধ্বংসের পথে টানিয়া লয়। এই সভ্যতার জন্য ইংরাজদের দেশে পার্লামেণ্টের অবস্থা শোচনীয়। ঐ সকল দেশের পার্লামেণ্টও যে প্রজার গোলামীর চিহ্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি এ বিষয়ে পড়াশুনা করিলে ও বিচার করিলে আপনার ভুল ধারণা দূর হইবে। ইহার জন্য ইংরাজদিগকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া কৃপা করাই দরকার। আমার মনে হয় যে, তাঁহারা সতর্ক জাত, কালক্রমে এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইবেন। তাঁহাদের সাহস আছে, পরিশ্রমীও বটেন, তাঁহাদের অন্তর একেবারে ময়লায় পূর্ণ নহে, এই জন্যই আমি তাঁহাদের আদর করি। তাঁহাদের সভ্যতা তাঁহাদের অন্তঃকরণকে এখনো নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

এখনো তাঁহাদের এই সভ্যতা-রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হয় নাই। কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহারা এই সভ্যতা-রোগে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন।

সপ্তম অধ্যায়

হিন্দুস্থান কেমন করিয়া গেল ?

পাঠক—সভ্যতা সম্বন্ধে ত আপনি অনেক কথা বলিলেন। আপনার কথায় আমি চিন্তিত হইয়াছি। এখন আমার এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে যে, ইউরোপীয়দের নিকট হইতে কি লওয়া যায়, আর কিই বা ত্যাগ করা দরকার, তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আর এই সঙ্গেই আমার মনে এই একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যদি এই সভ্যতা কেবল খাঁটি অসভ্যতা হয়, তাহা হইলে এমন রোগে ভুগিতে থাকিয়াও ইংরাজেরা কি করিয়া হিন্দুস্থানকে মুঠার ভিতরে লইল—আর আজ পর্য্যন্ত কেমন করিয়াই বা তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে ?

সম্পাদক—এখন আপনার এ প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা কিছুক্ষণ স্বরাজ সম্বন্ধেও বিচার করিতে পারিব। আপনার পূর্ব্বেকার প্রশ্ন আমি ভুলি নাই। কিন্তু আগে আপনার শেষের প্রশ্নের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই আমরা অগ্রসর হইব। ইংরাজেরা হিন্দুস্থান লয় নাই। বরঞ্চ, একথা বলা যায় যে আমরা উহাদিগকে তাহা দিয়া দিয়াছি। হিন্দুস্থানে উহারা নিজের বলে

টিকিয়া নাই, আমরা টিকাইয়া রাখিয়াছি বলিয়াই টিকিয়া আছে। কেমন করিয়া ইহা ঘটিয়াছে সে কথা তবে শুনুন। সেই দিনের কথা মনে করুন, কোম্পানী বাহাদুরের কল্পনা করুন, যখন উহারা ব্যাপারী হইয়া এদেশে আসিয়াছিল। উহাদিগকে বাহাদুর কাহারা করিয়াছিল। কোম্পানীওয়ালা বেচারীরা ত কখনো রাষ্ট্র গড়িবার খেয়ালও করে নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে সাহায্য কাহারা করিয়াছিল? কাহারা উহাদিগকে মান বেচিত?

ইতিহাস জোর গলায় শুনাইয়া দিতেছে যে, এই বীজ আমরাই বুনিয়াছি। পয়সার লোভে আমরা উহাদিগকে আপনার করিয়াছিলাম, উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলাম। ভাং খাওয়ার অভ্যাস আমাদের, আর আমরা কিনা দোষ দেই যে ভাং বেচে তাহাকে! উহাদিগকে দোষ দিলেই কি আমরা মুক্ত হইয়া যাইব! এক ভাং বিক্রেতাকে তাড়াইয়া দিলে আর একটা ভাং বিক্রিওয়ালা আসিয়া জুটিবে। খাঁটি দেশভক্তের কাজ শেষ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া কার্য্য করা। যদি ঠাসিয়া ঠুসিয়া খাওয়ার পর অজীর্ণ হয়, তারপর জলের দোষ দিলেই কি অজীর্ণ দূর হইবে? চিকিৎসক ত তিনিই যিনি ব্যাধির গোড়া ধরিতে পারেন। আপনি হিন্দুস্থানের রোগের যদি বৈদ্য হইতে চান তবে রোগের মূল দূর করা দরকার জানিবেন।

পাঠক—আপনি ঠিকই বলিতেছেন। আর আমাকে বুঝাইবার জন্য প্রমাণের দরকার নাই। আপনার অন্য আলোচনা শুনিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া আছি। বড় মজার মজার কথা আপনি বলিতেছেন। আপনি বলিয়া যান, আমার যেখানে সন্দেহ হইবে জিজ্ঞাসা করিব।

সম্পাদক—ঠিক কথা। কিন্তু আমার এখনো খট্‌কা রহিয়া গিয়াছে যে, ভবিষ্যতের আলোচনায় আপনার ও আমার মতে প্রভেদ

হইবে। তাহা হউক, যখন সন্দেহ হইবে তখন প্রমাণ উপস্থিত করা যাইবে। আপনি ত একথা শুনিয়াছেন যে, ইংরাজ ব্যাপারী আমাদের সাহায্যেই আমাদের দেশে পা ফেলিতে পারিয়াছে। যেখানে যেখানে আমাদের রাজারা পরস্পরের সহিত লড়াই করিতেছিল সেখানে তাহারাও উহাদের সাহায্য চাহে। কোম্পানী ব্যবসায় কার্য্যে যেমন কুশল, লড়াইতেও তেমনি কুশল ছিল। নীতি আর দুর্নীতির জন্য মাথা ঘামাইত না। ব্যবসা বাড়ানো আর টাকা জমানো—এই কেবল ছিল কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে আমরা উহাদিগকে সাহায্য করি, আর উহারাও আমাদের সাহায্য লয়, কুঠী খুলিতে থাকে। কুঠী রক্ষার জন্য উহারা সৈন্য রাখিত। তাহাদিগকে আমরা আমাদের কাজে লাগাইতাম। সুতরাং এখন উহাদের উপর দোষারোপ করা মিথ্যা। ঐ সময় হিন্দুমুসলমানেও ঝগড়া চলিতেছিল। ইহাতেও কোম্পানী সুযোগ পায়। এই রকম করিয়া আমরা নিজেরাই কোম্পানীর হাতে হিন্দুস্থান তুলিয়া দেওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম জোগাইয়াছি। এই জন্য হিন্দুস্থান কি করিয়া গেল তাহা না বলিয়া, আমরা কি করিয়া অপরের হাতে হিন্দুস্থান সমর্পণ করিয়া দিলাম সেই কথা বলাই ঠিক।

পাঠক—আচ্ছা এখন ইংরাজের অধিকার হিন্দুস্থানে কি ভাবে আছে ?

সম্পাদক—আমাদেরই কৃপায়। যেমন আমরাই নিজের দেশ উহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি, তেমনি এই দেশ উহাদের হাতে টিকাইয়া রাখিবার জিম্মাদারীও আমরাই করিতেছি। অনেক ইংরাজ বলিয়া থাকে—"আমরা হিন্দুস্থান তলোয়ারের জোরে লইয়াছি আর তলোয়ারের জোরেই রাজ্য করিতেছি।" কিন্তু এই কথা দুইটী

একেবারে ভুল। হিন্দুস্থানের রাজ্যাধিকারের মধ্যে তলোয়ারের কোনও স্থান নাই। যাহাদের জোরে উহারা টিকিয়া আছে সে হইতেছি আমরা নিজেরা।

নেপোলিয়ন ইংরাজদিগকে বেনে বলিয়া একটুকুও ভুল করেন নাই। যেখানেই তাহারা রাজত্ব করিতেছে সেখানেই ব্যবসার জন্য করিতেছে। উহাদের সৈন্য আর সিপাহী ব্যবসা-রক্ষার জন্যই আছে। যখন ট্রান্স্ভাল দেশে উহাদের ব্যবসার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না, তখন গ্ল্যাডষ্টোন বলিয়াছিলেন যে, ট্রান্সভাল হাতে রাখার দরকার নাই। ব্যবসার অবস্থা লাভজনক হওয়াতেই বাধার সৃষ্টি হয় এবং বাধাদান হইতেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চেম্বারলেন আবিষ্কার করেন যে, ট্রান্সভালের উপর ইংরেজের হুকুম চালাইবার অধিকার আছে। স্বর্গীয় প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"চাঁদে সোনা আছে কিনা।" তিনি জবাব দিয়াছিলেন,—"চাঁদে সোনা থাকিতে পারে না, কেন না থাকিলে ইংরাজ উহা দখল না করিয়া থাকিতে পারিত না।" পয়সাই ইংরাজের পরমেশ্বর। এই তত্ত্বটা ভাল করিয়া বুঝিয়া নিন, তাহা হইলে সমস্ত কথাই বুঝিতে পারিবেন। আজ আমরা ইংরাজদিগকে নিজের গরজে হিন্দুস্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি। উহাদের ব্যবসার আমরা সুবিধা করিয়া দিতেছি। উহারা আপনাদের ঢং ধাচ দেখাইয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া পয়সা লুটিতেছে। ইহার পরও আমরা যদি উহাদিগকেই মিথ্যা দোষ দেই, তাহা হইলে উহাদের রাজত্বের শিকড় এখানে আরো গাড়িয়া বসিবে। আমাদের পরস্পরের লড়াই ঝগড়াও উহাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করে। আমি এতক্ষণ যে সকল কথা বলিলাম তাহা যদি সত্য মনে করেন, তবে একথাও মানিতে হইবে যে, ইংরাজেরা ব্যবসার

জন্যই এখানে আছে এবং ইহাও ঠিক যে আমরাই ইংরাজদিগকে এদেশে রাখিয়াছি। এখানে থাকার মূলে উহাদের অস্ত্রবল নাই, আছে আমাদেরই সহায়তা। এখানে আজ একথাও আপনাকে বলিব যে, জাপানে জাপানীরা নিজ নিশান উড়াইতেছে না, ইংরাজ ব্যাপারীরা ইংরাজী নিশানই সেখানে ব্যাবসার জোরে উড়াইতেছে। ইহাও জানিবেন যে, জাপানের সহিত ইংরাজ বাণিজ্যের জন্যই সন্ধি করিয়াছে। আপনি দেখিবেন যে, ইংরাজেরা জাপানে কেমন কারবার বাড়ায়। ইংরাজ সারা দুনিয়াকে নিজের মালের বাজারে পরিণত করিতে চায়, যদিও তাহা হইতে পারে না। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদিগকে দোষও দেওয়া যায় না। তাহারা যাহা তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে তাহার জন্য না খাটিয়াও ত পারে না।

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুস্থানের অবস্থা

পাঠক—হিন্দুস্থান কেমন করিয়া ইংরাজের হাতে আছে একথা বুঝিলাম। এক্ষণে হিন্দুস্থানের অবস্থার উপর আপনার মন্তব্য জানিতে চাই।

সম্পাদক—হিন্দুস্থানের অবস্থা এখন ভারি খারাপ। সে কথা বলিতে আমার চক্ষে জল আসে, কথা বলার শক্তি লোপ পাইয়া যায়। আপনাকে পুরাপুরী বুঝাইতে পারিব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ

আছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, হিন্দুস্থান আজকালকার সভ্যতার ভারে যতটা ডুবিয়া আছে, ইংরাজের ভারে তত ডোবে নাই। ভারতবর্ষ সভ্যতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া গিয়াছে, উহাকে টানিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু দিন দিনই হিন্দুস্থান আরো ডুবিয়া যাইতেছে। আমার নিকট ধর্ম্ম প্রিয়। সেই জন্য আমার প্রথম দুঃখ এই যে হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম বলিতে এখানে আমি হিন্দু মুসলমান বা পার্শীর ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না, এই সকল ধর্ম্মের যে সার তাহাই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমরা ঈশ্বরে বিমুখ হইয়া পড়িতেছি।

পাঠক—ইহা কি করিয়া বলা যায়?

সম্পাদক—হিন্দুস্থানের উপর দোষ দেওয়া হয় যে, আমরা অলস, আর সাদা লোকেরা কর্ম্মঠ ও উৎসাহী। এ কথাটা আমরা মানিয়া লইয়াছি। আর এই জন্য আমাদের নিজেদের অবস্থা বদলাইতে চাই। হিন্দু মুসলমান পার্শী খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই এই কথা শিক্ষা দেয় যে, সাংসারিক বিষয়ে ঘরকন্নার কথায় বেশী মন না দিয়া ধার্ম্মিক বিষয়েই বেশী মন দেওয়া কর্ত্তব্য. আমাদের সংসারের লোভ কম করা ও পরলোকের লোভ বাড়ান দরকার। আমাদের আকাঙ্ক্ষার দ্রব্য পরমার্থই হওয়া উচিত।

পাঠক—বুঝিলাম আপনি ধর্ম্মের ভান চালাইতে চাহেন। অনেক ধূর্ত্ত এই রকম ছলনা করিয়া পৃথিবী লুটিয়াছে এবং আজও লুটিতেছে।

সম্পাদক—আপনি ধর্ম্মের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন। কপট লোক সকল ধর্ম্মের মধ্যেই আছে। যেখানে আলো সেখানে ছায়া আছেই। তবুও যাহারা ধর্ম্মের ছল করে তাহারা, যাহারা সাংসারিক

বিষয়ে ছল করে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা বলিতেও আমি দ্বিধা করি না। সভ্যতার ছায়ায় যত পাষণ্ড দেখা যায়, ধর্ম্মের মধ্যে তত কখনও দেখা যায় না।

পাঠক—সে কেমন? ধর্ম্মের জন্য হিন্দু মুসলমান মাথা কাটাকাটি করে। ধর্ম্মের জন্যই খৃষ্টানদিগের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্ম্মের জন্য নিরপরাধ হাজার হাজার লোক মারা গিয়াছে—তাহাদের আত্মত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহাদের উপর দিয়া কত সঙ্কটের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সভ্যতার হানির তুলনায় এই সকলের দ্বারা অধিকতর হানি হইয়াছে বলিয়াই ত মনে হয়।

সম্পাদক—আমার বক্তব্য এই যে, কপট ধর্ম্মের দুঃখ যদি বা সহ্য করা যায়, সভ্যতার দুঃখ অসহ্য। আপনি যে সকল কথা বলিলেন উহা অবশ্যই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের কথা। সকলেই একথা বুঝিতে পারে। কিন্তু এই সকল অপরাধের ফলে মানুষ মরিয়াই যায় মাত্র। যতদিন ভুলাইবার মত লোক থাকিবে ততদিন কপট-ধর্ম্মীও থাকিবে। কিন্তু উহার কুফল কিছু চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু সভ্যতার আগুনে যাহারা জ্বলে তাহাদের দুঃখের শেষ নাই। লোকে খারাপ জানিয়াও ঐ সভ্যতার আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মানুষ তখন না সংসারের, না স্বর্গের কথা ভাবে, সত্যকে ত একেবারেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু সাধারণের উহাই ভাল লাগে। অনিষ্ট করার শক্তি সভ্যতার ভিতর কত বেশী রহিয়াছে তাহা জানিলে, ধর্ম্মের নামে কৃত পাপ সভ্যতার চাইতে বরং ভাল বলিয়াই মনে হইবে। একথা আমি বলি না যে, ধর্ম্মের নামে পাপকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে। উহাকে দূর করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাও ধর্ম্ম ভুলিলে হইবে না, সত্যকার ধর্ম্মমার্গে চলিলেই তবে তাহা সম্ভব হইবে।

পাঠক—আপনি ত ইহাও বলিবেন যে, ইংরাজেরা যে শান্তির সুখ ভারতবর্ষকে দিয়াছে উহাও কোন কাজের নহে।

সম্পাদক—আপনি শান্তির সুখ যদি দেখিতে পাইয়া থাকেন তবে ভাল। কিন্তু আমি ত দেখিতে পাই না।

পাঠক—তাহা হইলে ঠগীরা, লুণ্ঠনকারীরা ও কোল্ ভীল * প্রভৃতি লোকেরা যে অনিষ্ট করিতেছিল, আপনার কথায় বুঝিতে হইবে যে তাহাতে ক্ষতি ছিল না?

সম্পাদক—আপনি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে, উহাদের অত্যাচার একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। যদি তাহাই হইত তবে দেশ উৎসন্ন যাইত। আর এদিকে এখন যাহা শান্তি বলা হয় উহাও মিথ্যা। আমি বলি যে, আমরা উহাতে ভীরু স্বভাব, অবলার ন্যায় অসহায় ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছি। একথা বলা যায় না যে, ভীল, পিণ্ডারীদের স্বভাব ইংরাজেরা বদলাইয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ প্রকার ভীল পিণ্ডারিদের অত্যাচারের কষ্ট সহ্য করিতে বরং স্বীকৃত আছি, কিন্তু আর কেহ আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে, তাহার লজ্জা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আমি ভীলদের তীরে বা তোপের মুখে মরাও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি, কিন্তু কাপুরুষ বনিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। ঐ সময়ের হিন্দুস্থানের অন্য রকম গৌরব ছিল। সকলে হিন্দুস্থানীদিগকে মূর্খ বলিয়া নিজের মূর্খতা প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানীরা কখনও কাপুরুষ ছিলেন না। এটা মনে রাখিবেন যে, যেখানে পাহাড়ী লোক বাস করে সেখানে বাঘ ভালুকও

---

* কোল ভীল সম্বন্ধে মহাত্মাজী পরে বলিয়াছেন যে, সত্য সত্য তাহারা কি প্রকারের লোক ছিল তাহা জানিতেন না বলিয়াই তাহাদের সম্বন্ধে একপ লিখিয়াছিলেন।

বাস করে। ওসব লোক যদি সত্যই ভীরু হইত, তাহা হইলে তাহাদের চিহ্নও থাকিত না। আপনি কখনো ক্ষেতে গিয়াছেন? আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, ক্ষেতে কৃষাণেরা আজও নির্ভয়ে হইয়া শুইয়া থাকে। আপনার অথবা কোনও ইংরাজের সেখানে শুইবার সাহস হইবে না। নির্ভয় হওয়াই ত বলবান হওয়া। শরীরে মাংসের পেশী বাড়িলেই তাহাকে বল বলে না। সামান্য বিচারেই আপনি একথা বুঝিতে পারিবেন। আর আপনি ত স্বরাজ চাহেন, আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ভীল পিণ্ডারী আসামী ও ঠগ—ইহারা ত আমার নিজের দেশেরই ভাই। উহাদিগের হৃদয় জয় করিয়া লওয়াই ত আপনার আমার কাজ। আপনার যদি নিজের ভাইয়েরই ভয় থাকে, তবে আপনি ত লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিতে পারিবেন না।

নবম অধ্যায়

রেল সম্বন্ধে আলোচনা

পাঠক—হিন্দুস্থানের শক্তি সম্বন্ধে আমার মোহ আপনি দূর করিয়া দিলেন, আমার কাছে কিছুই আর জমা-পুঁজি রাখিতে দিলেন না।

সম্পাদক—আমি ত এতক্ষণ দেশের ধার্ম্মিক অবস্থা সম্বন্ধেই আপনাকে বলিতেছিলাম। কিন্তু যখন আমি আপনাকে হিন্দুস্থানের দরিদ্রতার বিষয় শুনাইব, তখন আমার উপর হয়তো আপনার অনাদর আসিবে। কারণ আজ পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু লাভজনক বলিয়া মনে

আসিয়াছি, আমি দেখাইয়া দিব সে সমস্তই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। হিন্দুস্থানকে রেল, উকীল আর ডাক্তার মিলিয়া ভিখারী বানাইয়াছে। এই অবস্থার কথা যদি এখনও আমরা সময় থাকিতে না জানি, তাহা হইলে চারিদিক হইতে বেড়াজালে পড়িব।

পাঠক—এইখানে আপনার ও আমার ভিতর মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। যে সকল জিনিষ খুব ভাল বলিয়া বোধ হয় আপনি তাহারই উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। আর তবে বাকী রহিল কি?

সম্পাদক—ধৈর্য্য ধরিয়া শুনুন। এই সভ্যতার দোষ চোখে পড়া কিছু মুস্কিল বটে। ডাক্তারেরা শুনাইয়া থাকেন যে, ক্ষয়রোগী যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচিবার আশা রাখে। বাহিরের চেহারায় ক্ষয়রোগ কোন হানি প্রকাশ পাইতে দেয় না, বরং কখনো কখনো মুখের চেহারায় একটা ফাঁকা লাবণ্য আনিয়া দেয়। ইহাকেই রোগী বিশ্বাস করিয়া ঠকে—আর অন্তে নষ্ট পায়। সভ্যতারও এই অবস্থা জানিবেন। উহাও অ-দেখা রোগ। এ বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার।

পাঠক—ঠিক বটে, আচ্ছা এখন রেলের কথা বলুন।

সম্পাদক—ইহা নিশ্চয়ই আপনার কাছে ধরা পড়িয়াছে যে, যদি রেল না থাকিত তাহা হইলে হিন্দুস্থানে ইংরাজের আজ যে দখল তাহা থাকিত না। রেলে প্লেগের বিস্তার হয়। রেল না থাকিলে লোকের এদিকে সেদিকে যাতায়াত কমিয়া যাইত, আর ছোঁয়াচে রোগ দেশময় বিস্তৃত হইতে পারিত না। পূর্ব্বে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাধির ছুঁত হইতে পৃথক হইয়া থাকিতাম। রেল হইতে দুর্ভিক্ষও বাড়িয়াছে। সুবিধা পাইয়াই লোক নিজেদের উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া দেয়—যেখানে আক্রা সেইখানেই সব দ্রব্যের টান পড়ে, লোক বিচার শূন্য

হইয়া যায় এবং দুর্ভিক্ষের কষ্ট বাড়িতে থাকে। রেল হইতে দুষ্কর্ম্মও বাড়িয়া চলে। দুষ্ট লোক শীঘ্র শীঘ্র দুষ্কার্য্য করিতে পারে। হিন্দুস্থানের তীর্থ স্থান সকল অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে বড় বড় সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া তীর্থে যাইতেন, তাঁহারা সদ্ভাব লইয়া সেখানে গিয়া ঈশ্বরকে ভজন করিতেন। এখন লোকে অনাচার ফলাইতেই সেখানে গিয়া থাকে।

পাঠক—আপনি এক দিকের কথাই বলিয়া গেলেন। রেলে যেমন দুষ্ট লোক যাইতে পারে, ভাল লোকও ত তেমনি যাইয়া থাকেন। তাঁহারা কি রেল হইতে যতটা ভাল, তাহা পুরা গ্রহণ করেন না।

সম্পাদক—ভালর গতি পিপীলিকার ন্যায়। ভালর সহিত আর রেলের সহিত কোন মিল নাই। ভাল যাঁহারা করেন তাঁহারা নিঃস্বার্থ, তাঁহাদের তাড়া নাই। তাঁহারা জানেন, লোকের উপর ভালর ছাপ ফেলিবার জন্য এক যুগ লাগে। মন্দটা সহজেই হইতে পারে। গৃহ গড়িতে সময় লাগে, কিন্তু ভাঙ্গিতে সময় লাগে না। রেল যে সর্ব্বদাই নষ্ট করিতে থাকিবে এই পাকা কথা বুঝিয়া রাখিবেন। ইহাতে মতভেদ হইতে পারে যে, রেলের দরুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কিনা। রেলের দ্বারা যে পাপ প্রসার লাভ করে, আমার মনে তাহা পাথরের দাগের মত বসিয়া গিয়াছে, উহা মুছিবার নহে।

পাঠক—কিন্তু রেলের যাহা সব চেয়ে বড় লাভ তাহা উহার সকল হানি চাপাইয়া উঠে। আজ আমাদের দেশে যে নূতন জাগরণ দেখিতেছি উহা রেলের জন্যই। ইহা হইতে আমার মনে হয় যে মোটের উপর রেলদ্বারা ভালই হইয়াছে।

সম্পাদক—ইহাও আপনার ভুল। ইংরাজেরাই আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা প্রচার করিয়াছে যে, আমরা কখনও এক ছিলাম

না, এবং এক হইতে শত শত বৎসর লাগিবে। ইহা সম্পূর্ণ অসার কথা। যখন ইংরাজেরা হিন্দুস্থানে ছিল না তখন আমরা সকলেই এক ছিলাম। আমাদের এক বিচার ছিল, একই আচার ছিল। আর এই কারণেই ত উহারা এক রাজ্য খাড়া করিতে পারিয়াছে। আজ যে ভেদ ভাব আছে তাহা উহারাই পরে ঘটাইয়াছে।

পাঠক—এ বিষয় আর একটু বেশী করিয়া বোঝান দরকার।

সম্পাদক আমি যাহা বলিতেছিলাম তাহা বিনা বিচারে বলিতে ছিলাম না। একজাতি ছিলাম একথার মানে ইহা নয় যে, আমাদের মধ্যে ভেদ ছিল না। আপনি ইহা জানিবেন যে, যাঁহারা দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে জগন্নাথ পুরী, উত্তরে হরিদ্বার তীর্থ গড়িয়াছিলেন সেই সকল জ্ঞানী পুরুষদের একটা অবশ্যই উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহারা নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, ঈশ্বর ভজন ঘরে বসিয়াও হয়। তাঁহারাই আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন যে, ঈশ্বর হিন্দুস্থানকে যখন এক দেশ করিয়া গড়িয়াছেন, তখন উহার ভিতর একই ভাব হওয়া চাই। এই জন্য তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে তীর্থ তৈরী করিয়া লোকের ভিতর এমন ঐক্য জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে উহার তুলনা আর কোথাও নাই।

আমরা হিন্দুস্থানীরা যতটা এক ছিলাম এবং আজও আছি, দুইজন ইংরাজ ততটা এক নহে। কিন্তু আপনি ও আমি—আমরা সকলেই সভ্যতার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়াছি। তাই আমরা কেহ কেহ এখন নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। তাহাতেই আমাদের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি যদি মনে করেন যে, রেল দ্বারা ঐক্য ভাব বাড়িয়াছে তাহা হইলে আর আপনাকে কি বলিব? আফিং খোরও বলিতে পারে যে, আফিং-এ কি দোষ

আছে আফিম খাওয়াতে আমি তাহা বুঝিতেছি, সেই জন্যই আফিং ভাল জিনিষ। কথাগুলি আপনি বেশ ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। এখন আপনার মনে খট্‌কা উপস্থিত হইবে। কিন্তু আপনি নিজে নিজেই সে সকলের সমাধান করিতে পারিবেন।

পাঠক—আপনার কথা লইয়া বিচার অবশ্যই করিব, কিন্তু মনে ত এখনই প্রশ্ন জাগিতেছে। আপনি যে হিন্দুস্থানের কথা বলিলেন তাহা মুসলমানদের আসিবার পূর্ব্বেকার হিন্দুস্থান। কিন্তু আজ ইহাদের সংখ্যা এত যে, ইহারা একজাতি হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমান একে অন্যের নির্ঘাত শত্রু। কথাই আছে, মিঞা ও মহাদেবে বনে না। হিন্দু যদি পূর্ব্বমুখে পূজা করে, তবে মুসলমান পশ্চিমমুখে পূজা করে। মুসলমান হিন্দুদিগকে মূর্ত্তি-পূজক বলিয়া নিন্দা করে। হিন্দু গো-মাতার পূজা করে, আর মুসলমান গোরু খায়। পদে পদে ইহাদের বিরোধ। ইহা কেমন করিয়া মিটিতে পারে? আর হিন্দুস্থানই বা কেমন করিয়া এক হইতে পারে?

দশম অধ্যায়

হিন্দু মুসলমান

সম্পাদক—আপনার শেষ প্রশ্ন বড় গম্ভীর, কূট ও মুস্কিলের বলিতে হয়। কিন্তু বিচার করিলে উহাও সহজ হইয়া যাইবে। এই প্রশ্ন উঠিবার কারণও রেল, উকীল ও ডাক্তার। উকীল ও ডাক্তারের বিচার ত আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই করিতে হইবে। রেলের কথা

হইয়াছে; এখন শুনুন। ঈশ্বর মানুষকে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, সামর্থ্য মত হাত পায়ের কাজ করা সকলের পক্ষেই দরকার। আমরা যদি রেল ইত্যাদি নানা যানের ব্যবহার না করি তবে অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচিতে পারি। আমরা ইচ্ছা করিয়া নিজেরা কষ্ট ডাকিয়া আনি। ঈশ্বর মানুষের শরীর রচনা দ্বারাই তাহার শক্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

মানুষ সেই শরীরের সাহায্যে নিজের হৃদয়কেও বাঁধিবার ফন্দী বাহির করিয়াছে। ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন যে, সে যেন বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিবার জন্যই সেই বুদ্ধি ব্যবহার করিতেছে। যতদিন মৃত্যু না হয়, ততদিন এই শরীর দ্বারা আমি আসে-পাশের সকলের সেবা করিবার উপযুক্ত হইতে পারি, কিন্তু আমি অহঙ্কারবশতঃ সারা সংসারের সেবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছি। এই চেষ্টায় বিভিন্ন স্বভাবের ও বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্যের চাপ সহ্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সম্ভব হয় না, তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িতে হয়। আপনি জানিবেন, বাস্তবিক পক্ষে রেল এক তুফানী সাধনা। লোকে রেলের ব্যবহারের মোহে পড়িয়া ভগবানকে ভুলিয়া বসে।

পাঠক—কিন্তু এখন আমি আমার প্রশ্নের জবাব শুনিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছি। মুসলমান আসায় এদেশে এক জাতি আর কি করিয়া রহিল?

সম্পাদক—হিন্দুস্থানে যে ধর্ম্মের লোকই আসুক তাহাদের আগমনে ভারতের জাতীয়তা নাশ হইবার নহে। যাহারা নূতন আসে তাহারাও ইহার জাতীয়তা ভঙ্গ করিতে পারে না, তাহারাও এই

জাতির মধ্যেই মিশিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় এক দেশে একই জাতির বাস বলিতে হয়। দেশের মধ্যে বিদেশী লোককে গ্রহণ করিয়া এক করিয়া লইবার শক্তি থাকা চাই। ঐ শক্তি হিন্দুস্থানের ছিল ও আছেই। বস্তুতঃ এদেশে যত লোক তত ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহারা জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত, বিভিন্ন ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের ভিতর বিরোধের সৃষ্টি হয় না। হিন্দু যদি একথা মনে করে যে, সারা হিন্দুস্থানে কেবল এক হিন্দুই থাকিবে, তাহা হইলে তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পাশী প্রভৃতি যাহারা এই দেশকে নিজের মনে করিয়া বাস করিতেছে, তাহারা এক দেশের, এক মুল্লুকের লোক এবং দেশী ভাই। তাহাদের পরস্পরের স্বার্থের জন্যও এক হইয়াই থাকা চাই। পৃথিবীর কোনও দেশেই এক জাতির অর্থ এক ধর্ম্মের লোক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, হিন্দুস্থানেও এমন কখনো ছিল না।

পাঠক—কিন্তু হিন্দু মুসলমানের স্বাভাবিক শত্রুতা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন।

সম্পাদক—স্বাভাবিক শত্রু এই কথাটাই উভয়ের শত্রুতা সৃষ্টি করিয়াছে। যখন হিন্দু মুসলমান লড়িতেছিল তখন ঐ রকম কথার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু সে লড়াই কবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিক শত্রুতার কথা আর কিরূপে উঠিতে পারে? একথা স্মরণ রাখিবেন, আমরা যে ইংরাজের আসিবার পর লড়াই বন্ধ করিয়াছি এমন নহে। হিন্দু মুসলমানের রাজ্যে আর মুসলমান হিন্দুর রাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছিল। দুই জনারই কিছুদিন বাদে একথা মনে হইয়াছিল যে, লড়াই করিয়া কাহারও লাভ নাই। লড়াই আত্মহত্যার পথ এবং অস্ত্রের জোরে এক সম্প্রদায়

আর এক সম্প্রদায়কে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবে না। এই হেতু উভয়েই মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে স্থির করিয়া লইয়াছিল। এই ঝগড়া পুনরায় ইংরাজেরাই আরম্ভ করাইয়া দিয়াছে। মিঞা ও মহাদেবে বনে না একথাও অসত্য জানিবেন। কত রকমেরই প্রবাদ শিকড় গাড়িয়া বসে আর দেশের হানি করে। আমরা প্রবাদের মোহে একথাও ভুলিয়া যাই যে, অনেক হিন্দুমুসলমানের বাপ দাদা একই ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের রক্ত যেখানে এক, সেখানে ধর্ম্ম বদলাইলেই কি মানুষ শত্রু হইয়া যায়? উভয়ের ঈশ্বর কি ভিন্ন? ধর্ম্ম ত একই স্থানে পহুঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা। দুইজনে যদি দুই রাস্তায় চলে তবে হানি কি? ইহাতে দুঃখ করারই বা কি আছে? আর ঐ ধরণের প্রবাদ ত শৈব বৈষ্ণবের ভিতরেও চলিত আছে। কিন্তু ঐ রকম প্রবাদের বলেও কেহ এ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না যে, ইহারা দুইটী ভিন্ন জাতি। বৈদিক ধর্ম্মী ও জৈনদের মধ্যে খুব মতভেদ আছে। কিন্তু তবুও উহারা দুই জাতি নহে। আমরা দাসত্বে ডুবিয়া গিয়াছি, সেই জন্যই নিজের ঘরের ঝগড়া অপরের কাছে মিটাইবার জন্য লইয়া যাই।

যেমন মুসলমান মূর্ত্তি পূজার বিরোধী, তেমনি হিন্দুদের মধ্যেও ঐ প্রকার মতাবলম্বী আছে। যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞান বাড়িতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা বুঝিতে থাকিব। আমাদের প্রতিবেশীরা যে ধর্ম্ম পালন করেন তাহা যদি আমাদের পছন্দ না হয় তাহা হইলেও বৈর ভাব রাখিবার আবশ্যক নাই; তাঁহাদের প্রতি জোর জবরদস্তির দরকার নাই।

পাঠক—এক্ষণে গোরক্ষার উপর আমি আপনার বিচার শুনিতে চাই।

সম্পাদক—আমি নিজে গোরুর পূজা করি। গোরু হিন্দুস্থানের রক্ষাকারী, কেন না গোজাতির উপর হিন্দুস্থানের চাষ নির্ভর করে। শত রকমেই গোরু আমাদের হিতসাধক। গোরু যে হিতকারী মুসলমান ভাইরাও তাহা স্বীকার করিবেন।

কিন্তু আমি যেমন গোরুর পূজা করি তেমনি মানুষেরও পূজা করি। যেমন গোরু প্রয়োজনীয় জীব তেমনি মানুষ। হিন্দু মুসলমান বা অন্য যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই হোক, তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। গোরুকে বাঁচাইবার জন্য হিন্দু মুসলমানে লড়াই করিব, মুসলমানকে মারিব, এমন করিলে ত আমি মুসলমান ও গোরু উভয়েরই শত্রু হইব। এই জন্য আমার নিজের বুদ্ধিমত বলিতে পারি যে, গোরুকে বাঁচাইবার একটী উপায় - হাতজোড় করিয়া মুসলমানকে বুঝান যে, গোরু দ্বারা সকলেরই লাভ হয়, অতএব গো-রক্ষা করা দরকার। যদি তাঁহারা ইহা না বুঝেন তবে গোরুকে মারিতে দিতে হইবে। কেন না বাঁচানো আমার হাতের বশ নহে। আমার যদি গোরুর উপর খুব মায়া হয়, তবে তাহাকে বাঁচাইবার উপায় আমার নিজের প্রাণ দেওয়া, মুসলমানের প্রাণ লওয়া নয়। আমি ত ইহাকেই ধার্ম্মিক নিয়ম বলিয়া মানি। 'হাঁ' আর 'না'র ভিতরেই সর্ব্বদা বৈরিতা আছে। আমি যদি তর্ক করি মুসলমানও তর্ক করিবেন। আমি যদি মেজাজ বদলাই তবে তাঁহারাও মেজাজ বদলাইবেন। আমি যদি মাথা নিচু করি তবে তাঁহারাও মাথা নত করিবেন। আর যদি তাঁহারা মাথা নত নাও করেন তবু আমার মাথা নত করা কিছু খারাপ হইবে না। আমাদের বিরোধ হয় গোহত্যার জন্য। আমার মতে গো-রক্ষা-প্রচারিণী সভা আমাদের পক্ষে অহিতকর। যখন হইতে আমরা গোরক্ষা করা ভুলিয়া গিয়াছি তখন হইতেই গো-রক্ষিণী-সভার

আবশ্যক হইয়াছে। আমার ভাই যদি গোরু মারিতে তৈয়ার হয় তবে আমার কি করা উচিৎ? তাহাকে মারা চাই, না তাহার পায়ে পড়া চাই? যদি পায়ে পড়াই ঠিক হয়, তবে ত হিন্দুদেরও মুসলমান ভাইদের পায়ে পড়া দরকার। গোরুর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া, অত্যাচার করিয়া যখন হিন্দুরা উহাকে বধ করিয়া থাকেন, তখন উহাদিগকে কে রক্ষা করে? গোজাতির মধ্যে বলদকে হিন্দুরা যখন চাবুক মারে তখন কে তাহাকে বুঝাইতে যায়? অথচ এই গোরুর জন্যই দুই জাতি এক হইতে পারিতেছে না। আপনি হিন্দুকে যদি অহিংস আর মুসলমানকে যদি হিংসাশ্রয়ী মনে করেন, তবে অহিংস হিসাবে আপনার ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্য কি? অহিংস যে সে অপরকে হত্যা করিবে এমন ত কোনও শাস্ত্রে নাই। অহিংসের সিধা রাস্তা এই যে, সে একজনকে বাঁচাইবার জন্য অপরের উপর হিংসা করিতে পারে না। বিনয়ী হওয়াই অহিংসের কর্ত্তব্য ও পুরুষার্থ। কিন্তু ইহাও কি ঠিক যে সকল হিন্দুই অহিংস? বাস্তবিক সত্যকার অহিংস কেহই নাই। জীব-হিংসা ত আমরা হিন্দুরাও করিতেছি। কিন্তু উহা হইতে মুক্তি চাই। আর সেই জন্যই নিজেদিগকে অহিংস বলি। সাধারণভাবে যদি দেখেন, তবে দেখিবেন অনেক হিন্দু মাংসাহার করে। সুতরাং তাহাদিগকে কোনও রূপেই অহিংস বলা যায় না। জানিয়া শুনিয়া যদি মাংসাহারের অন্য অর্থ করা যায় তবে নাচার। সুতরাং হিংসাশ্রয়ী ও অহিংস বলিয়াই যে আমাদের বনে না ইহা বলা ভুল। স্বার্থপর ধর্ম্মশিক্ষক পণ্ডিত আর মৌলবী মোল্লারাই এই মত রটাইয়াছেন। আর ইংরাজেরা তাঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। উহাদের ইতিহাস লেখার লোভ আছে। সকল লোকের আচার নীতি জানার ভান করারও সখ্

আছে। কিন্তু ভগবান তাহাদিগকে দিয়াছেন পরিমিত শক্তি। সেই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরত্বই দাবী করিয়া বসিয়াছেন এবং নিজের ঢোল নিজেরাই পিটিয়া আমাদের মনে তাঁহাদের মনগড়া ধারণা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যে সব ব্যক্তি বেকুব নহে, চোখ মেলিয়া দেখিতে চায় তাহারা দেখিতে পারে যে, কোরাণ-শরিফে এমন শত শত বচন আছে যাহা হিন্দু মানিতে পারে। ভগবৎগীতায় এমন সকল কথা আছে যাহার বিরুদ্ধে মুসলমান কিছুই বলিতে পারে না। কোরাণ-শরিফের কতকগুলি কথা আমার বুদ্ধিতে আসে না, অথবা আমার পছন্দ হয় না বলিয়াই কি যাঁহারা উহা মানেন তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে হইবে? দুইজনে ইচ্ছা করিলেই তবে ঝগড়া হয়। আমার যদি ঝগড়া না করাই সঙ্কল্প হয়, তবে মুসলমান কি করিতে পারে, আর মুসলমানেরা যদি ঝগড়া না করিতে চায় তবে আমি কি করিতে পারি? হাওয়ার গলায় দড়ি দিয়া ত ঝগড়া করা যায় না। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মের রূপ বুঝিয়া উহাই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, মৌলবী ও পণ্ডিতকে মাঝখানে না টানিয়া আনে, তাহা হইলে ঝগড়া কখনো মাথা তুলিতে পারিবে না।

পাঠক—কিন্তু ইংরাজ কি দুই জাতিকে মিলিতে দিবে?

সম্পাদক—এ প্রশ্নের মূলে রহিয়াছে নিজের দুর্ব্বলতা। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দুই ভাইয়ে যদি পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায় তবে কি কেহ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? যদি তৃতীয় ব্যক্তি উহাদের মধ্যে বিদ্বেষ আনিয়া দিতে পারে তবে আমি বলি, উহাদের হৃদয়ে ভালবাসা কাঁচা ছিল। আমরা হিন্দু মুসলমান যদি কাঁচা মন লইয়া বসিয়া থাকি, তবে তাহার

জন্য ইংরাজের দোষ দেওয়ার দরকার নাই কাঁচা কলস অতি সহজেই ফুটা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। উহা হইতে বাঁচার উপায় এ নয় যে, ধাক্কা যাহাতে না লাগে তাহার চেষ্টা করা, পরন্তু তাহাকে পোড়াইয়া পাকা করিয়া ফেলাই তাহার উপায়। তাহা হইলে আর ফুটা হইবার ভয় থাকিবে না। এই রকমে আমাদের মন মজবুত হওয়া চাই। তৃতীয় ব্যক্তি তাহা হইলে হাত দিতে পারিবে না। যদি অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক ইহা বোঝেন তবে তাঁহারা পাকাই থাকিতে পারিবেন।

দুই জাতিতে বিশ্বাস নাই। মুসলমান এই হেতু লর্ড মর্লির নিকট কতকগুলি বিশেষ অধিকার চাহিয়াছিলেন। হিন্দু ইহাতে বিরোধ কেন করে? যদি হিন্দু বিরোধ না করে তবে ইংরাজের এবিষয়ে করিবার কিছু থাকে না। মুসলমানেরও বিশ্বাস কিছু কিছু বাড়িতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃভাবও বাড়িতে থাকে। আমাদের নিজেদের ঝগড়ার কথা ইংরাজের নিকট বলিতে লজ্জা পাওয়া উচিত। যদি এই রকম করা হয়, তবে হিন্দুরা কিছুই খোয়াইবে না। বেশ করিয়া হিসাব করিয়া দেখিবেন, যাহারা অপরের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাদের আজ পর্য্যন্ত কখনো হানি হয় নাই।

আমি একথা বলি না যে, হিন্দু কি মুসলমান কেহ কখনো লড়াই করিবে না। দুই ভাইয়ের যদি কেহ বেকুব হয়, তবে ঝগড়া ত হইবেই। কখনও কখনও হয়ত অনাবশ্যক মাথাও ফাটিবে। সকলে এক রকম হয় না; আর উত্তেজনার মুখে অনেকে দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলে। উহা আমাদিগকে সহিতে হইবে; উহার জন্য আমাদের উকীল রাখা ও আদালতে যাওয়া উচিত নহে। দুই জনের ঝগড়ায় এক জনের বা দুই জনের যদি মাথা ফাটিয়া থাকে, তবে ইহার মধ্যে আবার ন্যায্য কোন্ জিনিষটা যে বিচার চাহিব?

একাদশ অধ্যায়

উকীল

পাঠক—আপনি বলিতেছিলেন যে, যদি লোকে ঝগড়া করে তাহার বিচার করাইও না। ইহা ত একটা অদ্ভুত কথা।

সম্পাদক—অদ্ভুত বলুন আর যাহাই বলুন, কিন্তু কথা ঠিক। আপনার প্রশ্ন আমাকে উকীল ডাক্তারের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছে। আমার মতে উকীলেরা হিন্দুস্থানকে গোলামীতে ডুবাইয়াছেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাড়াইয়াছেন, এবং তাঁহারা ইংরাজেরও শক্তি বাড়াইতেছেন।

পাঠক—দোষ দেওয়া ত সহজ, কিন্তু প্রমাণ করায় মুস্কিল আছে। উকীল না থাকিলে কে আপনাকে মুক্তির পথ বলিয়া দিত। তাহারা ব্যতীত গরীবকে রক্ষাই বা কে করিত। তাহারা ছাড়া কেই বা ন্যায় বিচার আনিয়া দিতে পারিত। দেখুন, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ কত লোককে বাঁচাইয়াছেন। নিজের জন্য তিনি ঐ কার্য্যে এক পয়সাও লন নাই। যে কংগ্রেসের প্রশংসা আপনি করিতেছিলেন তাহাও উকীলদিগের দ্বারাই চলে, তাঁহাদের সাহায্যেই কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে। আপনি ইহাদের ব্যবসার নিন্দা করিয়া অন্যায় করিতেছেন। আপনার হাতে সংবাদপত্র পরিচালনার সুবিধা আছে, আর সেই জন্যই যাহা মনে আসে তাহাই বলিবার সুবিধা পাইতেছেন।

সম্পাদক—আমিও পূর্ব্বে আপনার মত ভাবিতাম। আমি আপনাকে এমন কথা বলি নাই যে, উকীলেরা কোনও দিন কোনও

ভাল কাজ করেন নাই। মনোমোহন ঘোষের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। তিনি গরীবদিগকে সাহায্য করিতেন, এ কথা ঠিক। কংগ্রেসকেও যে উকীলেরা সেবা দিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। উকীলেরা ত মানুষ বটে, আর মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু ভাল পাওয়া যাইবেই। কিন্তু যে সকল উকীল পরোপকার করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা উকীল একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমি আপনাকে কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে, উকীলের ব্যবসাই তাঁহাদিগকে নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করায়। ভুল করিয়াই তাঁহারা লোভের পথে চলিতেছেন। আর উহা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন এমন লোক কম আছেন।

হিন্দু মুসলমান লড়াই করিতেছে। তৃতীয় ব্যক্তি বলিবে, ঝগড়ার কথা ভুলিয়া যাও। দুইজনেরই হয়ত দোষ আছে, ভবিষ্যতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও। তাহারা ধরুন, উকীলের নিকট গেল। উকীল কর্ত্তব্য বুঝিলেন, মক্কেলের পক্ষই লইতে হইবে। মক্কেল যে দলীলের কথা জানিতেন না তাহা খোঁজ করিয়া বাহির করা তখন উকীলের কার্য্য। যদি তাহা না করা হয়, তবে ব্যবসায়ে কলঙ্ক হইবে। এমনি করিয়া যাহাতে লড়াই বেশী বাড়িয়া উঠে উকীল ত তাহারই পরামর্শ দেন।

তাছাড়া যাঁহারা উকীল, তাঁহারা অপরের দুঃখ দূর করার জন্য ওকালতী ব্যবসা গ্রহণ করেন না। টাকা রোজগার করিবার জন্যই লোকে উকীল হয়। রোজগার করার উহা একটা পথ। আমার নিজের জানা কথা এই যে, ঝগড়া হইলে উকীলেরা খুসী হয়। মোক্তারও ঐ একই থলির ভাগীদার। যেখানে ঝগড়া নাই, তাঁহারা সেখানেও ঝগড়া ঘটান। ইঁহারা দালালের কাজ করেন, আর জোঁকের মত

গরীবদের গায় আঁটিয়া বসেন ও রক্ত চুষিয়া লন। এ ব্যবসাই এমনি যে, ইহাতে মনুষ্যের মধ্যে নীচতা বাড়িতে থাকে। যাহার কিছু করিবার নাই এমনি ফাল্‌তু লোকই উকীল হইয়া থাকে। অলস লোক আয়েস আরাম ভোগ করিবার ইচ্ছায় উকীল হয়। ইহাই আসল অবস্থা। অন্য যে সকল যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা ভান মাত্র। ওকালতী খুব সম্মানজনক ব্যবসা—এ যুক্তি উকীলেরাই বাহির করিয়াছেন। তাঁহাদের আচার নিয়ম তাঁহারাই গঠন করেন এবং তাহার প্রশংসাও তাঁহারাই করেন। লোকের নিকট হইতে কত ফী লইতে হইবে তাঁহাও তাঁহারাই স্থির করেন, লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য তাঁহারা এমন আড়ম্বর ও ঠাট সৃষ্টি করিয়াছেন যে, দেখিয়া মনে হয় যেন দেবলোক হইতে দেবতা নামিয়া আসিয়াছেন। মজুর যত পয়সা চায়, তার চাইতে বেশী পয়সা উকীল কেন চাহিবে? মজুর অপেক্ষা কি উকীলের অবশ্যকতা বেশী? যদি মজুর অপেক্ষা অবশ্যকতা অধিকও হয় তাহা হইলে তাঁহারা কি বেশী উপকার করিয়াছেন? তা ছাড়া যে উপকার বেশী করে তাহারই কি বেশী পয়সা লওয়ার অধিকার আছে। পয়সার জন্য যে কার্য্য তাহা ভাল কেমন করিয়া বলা যায়? ওকালতী ব্যবসা সম্বন্ধে এই কয়টা কথাই আপনাকে বলিলাম. অন্য কথা ছাড়িয়া দিতেছি।

উকীলেরা হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া কত বাড়াইয়াছেন, যাঁহারা জানেন তাঁহাদের নিকট সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তাঁহাদের জন্য কত পরিবার মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কত ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর চির জন্মের শত্রুতা গড়িয়া তুলিয়াছেন। কত রাজ-রাজড়া উকীলের জালে পড়িয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। উকীলের কায়দায়

পড়িয়া অনেক গৃহস্থের অর্থ লুট হইয়া গিয়াছে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা সব চাইতে বেশী অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, ইংরাজের শিকলে আমরা জড়াইযা পড়িয়াছি। বিবেচনা করিলে আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরাজের আদালত আমাদের লাভের জন্য নয়। যাহারা নিজেদের অবিচার পাকা করিতে চায়, তাহারাই আদালতের সাহায্যে লোককে বশে রাখে। লোকে যদি আপোসে বিবাদ মিটাইয়া লয় তবে তৃতীয় ব্যক্তির মাঝখানে পড়িবার আবশ্যক কোথায়? আসলে লোকে যখন মারপিট করিয়া, অথবা বন্ধু, কুটুম্বকে পঞ্চাইত বানাইয়া লড়াই করিত, তখন তাহারা পুরুষ ছিল। আদালত হওয়াতে তাহারা কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে। এখন একের সহিত অপরের লড়াই ত অসভ্যতা বলিয়াই মনে করা হয়। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া আমাদের ঝগড়া মিটাইবে ইহা কি কম অসভ্যতা? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তৃতীয় ব্যক্তির বিচার একেবারে ঠিক হওয়ার কথা। সত্য কথা যে কি তাহা ত উভয় পক্ষই জানে। আমরা বেকুব বলিয়া আমরা মানিয়া লই যে, আমাদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া তৃতীয় ব্যক্তি হিত করিবে।

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, ইংরাজেরা আদালতের ভিতর দিয়া আমাদের উপর অধিকার জমাইতেছে। আর আমরা যদি উকিল না হই তবে আদালত বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি ইংরাজই জজ হইত, ইংরাজই সিপাহী হইত, তবে ইংরাজেরা ইংরাজের উপরই রাজত্ব করিত। কিন্তু হিন্দুস্থানী উকীল ও জজ ছাড়া কাজ চলে না। উকিলের ব্যবসা কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল এবং কেন যে তাহাদিগকে পেয়ার করা হয়, তাহা যদি সব বুঝিতেন, তবে ওকালতীর পয়সার উপর আমার যেমন ঘৃণা আপনারও তেমনি হইত। ইংরাজ রাজ্যের এক

প্রধান চাবিকাটি হইতেছে আদালত। আদালতের চাবি হইতেছে উকীল। যদি উকীলেরা ওকালতী ছাড়েন এবং ঐ ব্যবসা বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় নীচ মনে করেন, তবে ইংরাজের রাজত্ব এক দিনেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। উকীলেরাই হিন্দুস্থানী লোকের উপর এই কলঙ্ক দিয়াছেন যে, আমরা ঝগড়াটে এবং মাছ যেমন জলকে ভালবাসে আমরা তেমনি আইন আদালতকে ভালবাসি। উকীলের সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা বলিলাম, জজদিগের সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। উহারা দুইজনে মাসতুত ভাই, একে অপরকে দৃঢ় করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ডাক্তার

পাঠক—উকীলদের বিষয় বুঝিলাম। তাঁদের দ্বারা যে ভালটা হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ভাগ্যের জোর বলিতে হইবে। ব্যবসার দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাদিগকে খারাপই মনে হয়। কিন্তু আপনি যে ডাক্তারকেও একই সঙ্গে জড়াইতেছেন তাহা কেমন করিয়া হইবে?

সম্পাদক—আমি যে বিচার আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি উহা এখন আমার কথা হইলেও আমি ভাবিয়া এ সব কথা বাহির করি নাই। বিলাতী সংস্কারকেরা আমার অপেক্ষা কড়া কড়া শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও উকীল ডাক্তারকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। একজন লেখক সমগ্র বর্ত্তমান পদ্ধতিকেই

বিষবৃক্ষের সহিত তুলনা দিয়াছেন। ঐ বৃক্ষের ডাল উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় পেশাদারেরা। উহার দ্বারা সমস্ত নীতি ও ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে। উহার মূলে যে দুর্নীতি আছে একথাও তাঁহারাই বলিতেছেন। আপনি ঠিক জানিবেন যে, আমি পকেট হইতে নূতন নূতন মত উপস্থিত করিয়া আপনার সম্মুখে রাখিতেছি না।

আজ ডাক্তার সম্বন্ধে আপনার যে প্রকার মোহ, অমনি আমারও একদিন ছিল। এমন এক সময় ছিল যখন ডাক্তার হওয়া আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। ডাক্তার হইয়া সাধারণের সেবা করিব এই ইচ্ছা এক সময় সত্যই আমি পোষণ করিতাম। এখন সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের এ দেশে বৈদ্যের ব্যবসা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য হইত না। কেন এমন হইয়াছিল? আজ আমি তাহার ঠিক মূল্য বুঝিতে পারিতেছি।

ইংরাজেরা ডাক্তারী বিদ্যার জোরে আমাদিগকে নিজের মুঠার ভিতর আনিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারদের মধ্যে ছলনার অভাব নাই। মোগল বাদশাহকে ডাক্তারই ফুসলাইয়া ছিল। ঐ ডাক্তার বাদশাহের ঘরে কোনও ব্যারাম ভাল করিয়া ইনাম চাহিয়া লয়। আমীরের কাছে গিয়াও এই ডাক্তারই পহুঁছিয়াছিল।

ডাক্তারেরা আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ডাক্তারের অপেক্ষা ত আনাড়ী বৈদ্যকেও আমার ভাল বলিতে ইচ্ছা হয়। বিচার করিয়া দেখুন ডাক্তারের কাজ কেবল শরীরকে বাঁচানো। কিন্তু শরীর বাঁচাইবার জিনিষ নয় শরীরে রোগ হইলে ডাক্তারের কাজ রোগ দূর করা। রোগ হয় কেন? নিজের দোষেই। পেটের মাপের অতিরিক্ত খাইয়া লোকের অজীর্ণ হইল, গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বড়ী দিলেন, ভাল হইয়া গেল। ফের আবার খুব করিয়া খাইল,

পুনরায় অজীর্ণ হইল। আবার বড়ি খাইল। এই রকম চলিতে থাকে। আর যদি আমি বড়ি না খাইতাম, অজীর্ণতার দণ্ডভোগ করিতাম, তবে বে-হিসাবে আর খাইতাম না। ডাক্তার মাঝখানে পড়িয়া আমার বে-হিসাবী খাওয়ার সহায়তা করিয়া দিল। আমার শরীর আরাম হইল বটে, কিন্তু আমার মন দুর্ব্বল হইল। এমনি করিয়া চলিতে চলিতে এমন অবস্থা হয় যে, আমার মনের উপর আমার কিছুমাত্র বশ থাকে না।

আমি দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলাম। আমাকে ডাক্তার ঔষধ দেওয়ায় রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। আর কি তারপর আমি দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইব না? যদি ডাক্তার মাঝখানে না পড়িত তবে প্রকৃতি নিজের কার্য্য করিত। আমার মন দৃঢ় হইত, আর পরিণামে আমি ভোগ-বিলাসে বিরত হইয়া সুখী হইতাম।

হাসপাতাল পাপের মূল। উহা আছে বলিয়াই লোকে শরীরের যত্ন কম করে, আর দুর্নীতিও খুব বাড়ে। বিদেশী বিলাতী ডাক্তার ত সব চেয়ে অধম। উহারা শরীরের মিথ্যা যত্ন লওয়ার জন্য লাখ লাখ জীবের প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। জীবন্ত প্রাণীর উপরও পরীক্ষা করে। এরকম ব্যবস্থা কোনও ধর্ম্মই অনুমোদন করে না। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্শী সকলেই বলেন মানুষের শরীরের জন্য এত জীবের প্রাণ লওয়ার আবশ্যক নাই। ডাক্তার আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া থাকে। উহাদের অনেক ঔষধে চর্ব্বি ও মদ থাকে। এই দুয়ের মধ্যে একটিও হিন্দু মুসলমানের ছুঁইবার যোগ্য নয়। আমরা সভ্যতার মোহ রচনা করিয়া সমস্ত কথাই ভুল বুঝিয়া অভিমান করিয়া থাকি। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, আমরা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছি। এই অবস্থায় আমরা লোক-সেবার যোগ্য নই। আমাদের

শরীর ও বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইংরাজী বা ইউরোপীয়ান ডাক্তারের শিক্ষা গোলামীর বাঁধন দৃঢ় করার সহায়ক।

আমরা ডাক্তার হই কেন? ইহার হেতু সম্মানের লোভ এবং পয়সা রোজগারে লোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার মধ্যে পরোপকারের কথা নাই। পরোপকার যে নাই তাহা আমি দেখাইয়া দিয়াছি। এই ব্যবসায়ে লোকের লোকসান। ডাক্তারেরা কেবল আড়ম্বর বাড়াইয়া বাড়াইয়া ফী লইতেছে। পয়সার মূল্যে ঔষধ দিয়া তাহারা টাকা আদায় করিয়া লয়। লোকও আরাম হওয়ার ভরসায় ঠকে।

ডাক্তারের ব্যবসা যদি এইরূপ হয়, তবে যাহারা তাহাদের মত পরোপকারের ভান করে না সেই সব হাতুড়ে চিকিৎসকও যে তাহাদের অপেক্ষা ভাল তাহাতে কি কিছুমাত্র সন্দেহ আছে?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্যিকার সংস্কার কি?

পাঠক—আপনি রেলকেও মাটির সাথে মিশাইয়া দিয়াছেন, উকীল ডাক্তারকেও আমল দিতেছেন না। আমি দেখিতেছি, আপনি কল-কব্জা ও মেসিনের সমস্ত কার্য্যকেই হানিকর বলিয়া বাদ দিতে চান। তাহা হইলে সভ্যতার মধ্যে আর বাকী কি রহিল?

সম্পাদক—এই প্রশ্নের জবাব কিছুমাত্র কঠিন নহে। আমার … এই যে, আমাদের সভ্যতার কাছে পৃথিবীতে আর কোনও সভ্যতাই

দাঁড়াইতে পারে না আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কাছাকাছি কিছু করিতে পারে এমন লোক দেখা যায় না। রোম মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, গ্রীস ধ্বংস হইয়াছে, মিশরের আধিপত্য আজ আর নাই। জাপান পাশ্চাত্য দেশের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চীনের অবস্থা কিছু বলা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ পড়িয়া গেলেও শিকড় তাহার মজবুত আছে। যে রোম ও গ্রীস নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাদের পুঁথির পাঠই ইউরোপীয়েরা পড়িতেছে। উহাদের মত ভুল করিবে না এই অহঙ্কারেই তাহারা আজ মত্ত। এমনি দীন তাহাদের অবস্থা, কিন্তু হিন্দুস্থান অচল আছে। ইহাই হিন্দুস্থানের গৌরব। হিন্দুস্থানের উপর এই দোষ দেওয়া হয় যে, হিন্দুস্থান এতই অসভ্য, এতই অজ্ঞান ও এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, ওখানে কোনও পরিবর্ত্তনই যায় না। এই অপরাধ আমাদের ভূষণ, কলঙ্ক নয়। অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে কি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করা যায়? অনেক পথ-প্রদর্শক আসিতেছে যাইতেছে কিন্তু হিন্দুস্থান অচল আছে। ইহাই উহার সৌন্দর্য্য, ইহাই উহার আশার আলোক।

সভ্যভাবে চাল চলনের মানে নিজ কর্ত্তব্য পালন। মন আর ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে রাখার নামই নীতি পালন। আমরা এমনি করিয়া নিজে নিজেকে জানিতে পারি অনেক ইংরাজ লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, উপরের বিচার অনুসারে হিন্দুস্থানের কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিবার নাই। একথা একেবারে খাঁটি।

মানুষের বৃত্তি সকল চঞ্চল। মন দৌড়াইয়া বেড়ায়। রিপুকে যতই প্রশ্রয় দেওয়া যায় সে ততই অসংযত হইয়া উঠে। অনেক পাইয়াও সে সুখী হইতে পারে না। ভোগ করিতে পারিলে ভোগ

করিবার ইচ্ছা বাড়িতেই থাকে। এই জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উহার একটা সীমা বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। অনেক বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সুখ দুঃখ মনের ভিতর। আমীরের আমীরী তাহাকে যেমন সুখ দেয় না, গরীবের গরীবীও তেমনি দুঃখের কারণ হয় না। আমীর দুঃখী ও গরীব সুখী ইহাও দেখা যায়। কোটি কোটি লোকেরও গরীবই থাকিতে হইবে। এই জন্য মানুষকে ভোগের বাসনা ছাড়িতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইহা দেখিয়াই ভোগের ইচ্ছা ছাড়িয়াছিলেন। হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল তাহা দ্বারাই আমরা কার্য্য চালাইতেছি। হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে কুটীর ছিল তাহাই এখনো স্থির রাখিয়াছি। হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে শিখিবার ও পরিবার ধরণ ছিল আমরা তাহাই বজায় রাখিয়াছি। হানিকর প্রতিযোগিতামূলক কোনো রীতিনীতিকেই আমরা আমাদের কাছে ভিড়িতে দেই নাই। সকলে নিজ নিজ ব্যবসা করিতেছিলাম। দস্তুর মত মজুরীর ব্যবস্থা ছিল। একথা সত্য নয় যে, আমরা কলের খেঁজ ও কল বানাইবার বিদ্যা জানিতাম না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেখিয়াছিলেন যে, মানুষ যদি কলের বেড়াজালে পড়ে তবে সে গোলাম হইয়া যাইবে, আর ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে। তাঁহারা অনেক বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নিজেদের হাত পা কাজে আনাতেই সত্যকার সুখ—উহাতেই স্বাস্থ্য।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে বড় বড় শহর বানানো মিথ্যা ফাঁদ পাতারই সামিল। তাহাতে অনেক ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হয়, লোকে সুখী হইতে পারে না। চমৎকার বাজার আর জমকালো অট্টালিকা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমীরেরাই গরীবকে লুটিবার

সুবিধা পায়। এই জন্য তাঁহারা গ্রামেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, রাজা ও তলোয়ারের বল অপেক্ষা নীতির বল অধিক। সেই জন্যই তাঁহারা রাজাকে সদাচারী পুরুষ, ঋষি ও ফকিরের নীচেই স্থান দিয়াছিলেন। যে জাতির এই প্রকার রীতিনীতি, তাহারা অপরকে শিক্ষা দিতে পারে, অপরের নিকট হইতে তাহাদের শিক্ষা লওয়ার কিছু নাই।

আমাদের দেশেও আদালত ছিল, উকীল ডাক্তার ছিল—কিন্তু সমস্তই সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতরে। সকলেই জানিতেন যে, ঐ সকল কাজ প্রশংসার যোগ্য কাজ নয়। তাছাড়া উকীল বৈদ্য ইত্যাদি লোকের টাকাও লুটিয়া লইতেন না। তাঁহারা লোকের সাহায্য করিতেন, মাথার উপর বসিয়া থাকিতেন না। বিচার ঠিক ঠিক হইত। লোকের আদালতে না যাওয়াই ছিল নিয়ম। লোককে ফোঁসলাইবার জন্য স্বার্থান্বেষীদের দল ছিল না। ঐ রকম নোংরা কাজ রাজ-রাজড়াদের আশে পাশেই থাকিত। বাকী লোকেরা রাজ রাজড়ার ভীড় হইতে দূরে নিরিবিলিতে গ্রামের ভিতর আনন্দে ক্ষেতের কাজ করিত। তাহাদের খাঁটি স্বরাজ ছিল।

আর আজিও যেখানে এই অভিশপ্ত সভ্যতা পহুঁছে নাই সেখানে হিন্দুস্থান এখনো আগের মতই আছে। সেখানে যদি এই সব নূতন ধরণের ধারণা চালান হয়, তবে লোক উপহাস করিবে। তাহাদের উপরে ইংরাজ রাজ্য করিতে পারে না, আপনিও ইচ্ছা করিলে সব সময় রাজ্য করিতে পারিবেন না। আজ যাহাদের নামে আমরা কথা বলি, তাহাদিগকে আমরা জানি না, তাহারা আমাদিগকে জানে না। আপনার আর আপনার মত যাঁহাদের দেশের প্রতি ভালবাসা আছে তাঁহাদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আপনারা আগে

দেশের যেখানে রেল নাই, সেই সব স্থানে ছয়মাস ঘুরিয়া পুনরায় দেশকে নূতন করিয়া ভালবাসিতে শিক্ষা করুন। তারপর যেন আপনারা স্বরাজ্য সম্বন্ধে কথা বলেন।

আপনি হয়ত বুঝিয়াছেন, সত্যকার সভ্যতা আর সত্যকার সংস্কার আমি কোন জিনিষকে বলিতেছি। উপরে যে চিত্র আঁকিলাম ঐরূপ হিন্দুস্থান যেখানে আছে সেইখানে কেহ গিয়া যদি অদল বদল করে সে পাপী—সে দেশের শত্রু।

পাঠক—আপনি যেরূপ বলিলেন হিন্দুস্থান যদি সেইরূপ হয় ত ভাল কথা। কিন্তু যে দেশে দুই বৎসর বয়সের বালিকার বিবাহ হয়, যেখানে বার বৎসরের ছেলে মেয়েরা ঘর সংসার করে, যে দেশে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, যে দেশে ধর্ম্মের নামে কুমারী কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করে, যে দেশে ধর্ম্মের নামে ছাগবলি দেওয়া হয়, সে দেশ ত হিন্দুস্থানই বটে : ইহাও কি আপনার মতে সভ্যতার লক্ষণ ?

সম্পাদক—আপনি ভুল করিতেছেন। আপনি যে সব কথা বলিলেন সেগুলি ত ত্রুটী, সেগুলিকে সভ্যতা কেহ বলে না। ঐ সকল দূর করার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেও থাকিবে। ঐ সকল ত্রুটী সভ্যতার পুরা অবস্থাতেও রহিয়া গিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যে জাগরণ আসিয়াছে উহাকে আমরা ত্রুটী সংশোধনের কাজেই লাগাইতে পারি। আমি আপনার কাছে বর্ত্তমান সভ্যতার লক্ষণ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছি, উহার অনুরক্ত ব্যক্তিরাও তাহা মানিয়া লন এবং হিন্দুস্থানের সভ্যতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার উপাসকেরাও তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন না। কোনও দেশেই কোন সভ্যতাতেই সকল মানুষের সম্পূর্ণতা আসে নাই।

হিন্দুস্থানী সভ্যতার দৃষ্টি ছিল নীতি দৃঢ় করার দিকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা নাস্তিক ভাবাপন্ন। হিন্দুস্থানী সভ্যতা আস্তিক ভাবাপন্ন।

এই সব কথা জানার পর সন্তান যেমন মাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, আমাদেরও হিন্দুস্থানী সভ্যতাকে তেমনি করিয়া আঁকড়াইয়া থাকা উচিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হিন্দুস্থান কিরূপে স্বাধীন হইতে পারে

পাঠক—সভ্যতার সম্বন্ধে আপনার মত জানিলাম। আপনার কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। সমস্ত কথা একেবারে গ্রহণ করা যায় না। ইহা আপনিও হয়ত মানিবেন, এবং আপনি হয়ত এমন আশাও করেন না। এই বিচার অনুসারে হিন্দুস্থানের মুক্তির কি উপায় আছে বলিয়া আপনি মনে করেন?

সম্পাদক—এমন আশা আমি করি না যে, সকলে আমার কথা শুনিবা মাত্রই মানিয়া লইবেন। আপনার ন্যায় যিনি আমার বিচার জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকট আমার মত ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য মনে করি। আমার বিচার তাঁহাদের পছন্দ হয় কিনা তাহা সময় মত বোঝা যাইবে।

হিন্দুস্থানের মুক্তির উপায় ত পরোক্ষভাবে বিচার করাই হইয়াছে; এইবারে না হয় আসুন, স্পষ্ট ভাবেই বিচার করা যাক্।

এ কথা ত সকলেই মানে যে, যে কারণে মানুষ রোগী হয় সেই

কারণ দূর করিতে পারিলেই সে সুস্থ হইয়া উঠে। তেমনি যে কারণে হিন্দুস্থান দাসত্ব লইয়াছে, সেই সকল কারণ দূর করিলে দাসত্বও দূর হইবে।

পাঠক—যদি হিন্দুস্থানের সভ্যতাকে সব চাইতে ভাল মনে করেন তবে হিন্দুস্থানের দাসত্ব কি করিয়া হইল?

সম্পাদক—আমি যেমন বলিয়াছি সভ্যতা সেই রকমেরই ছিল। সমস্ত সভ্যতারই আপদের দিন আসিয়া থাকে। যে সভ্যতা অটল, পরিণামে সেই সে আপদ দূর করিতে পারে। হিন্দুস্থানের সন্তানদের ভিতর দুর্ব্বলতা ছিল। তাই নূতন সভ্যতা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই ঘের হইতে মুক্তি পাওয়ার শক্তিও উহার আছে। ইহাই উহার বৈশিষ্ট্য জানিবেন। তা ছাড়া সারা হিন্দুস্থানকেও এই সভ্যতায় ছাইয়া ফেলে নাই। যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছে ও তাহার পাঁকে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারাই দাসত্বেও ডুবিয়াছে।

আমরা আমাদের নিজেদের ছোট মাপে সারা সাংসারকে মাপিয়া থাকি। নিজে যখন গোলাম হইয়াছি তখন সারা সংসারকেই গোলাম মনে করি। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম হয় না। আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে নিজেদের গোলামী দেশেরই গোলামী। নিজেদের দাসত্ব দূর হইলে দেশেরও দাসত্ব দূর হইবে। ইহাই স্বরাজ্যের সংজ্ঞা। নিজের উপর নিজের আধিপত্যই স্বরাজ্য, আর তাহা ত নিজের হাতেই আছে। এই স্বরাজ্য স্বপ্ন মনে করিবেন না। এ স্বরাজ্য কেবল মনে করিয়া রাখার মত জিনিষও নয়। স্বরাজ্য এমন জিনিষ যে, উহার স্বাদ নিজে একবার পাইলে অপরকে সে স্বাদ পাওয়াইবার জন্য জন্ম-ভর যত্ন করিয়া যাইতে হয়। আসল কথা ত এই যে, প্রত্যেকেই যেন স্বরাজ্য ভোগ করে। যে নিজে

ডুবিতেছে সে অপরকে পার করিতে পারে না, যে সাঁতরাইতে জানে সেই পারে। নিজে দাস থাকিয়া অপরকে মুক্ত করার চেষ্টা নিষ্ফল।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। আমাদিগকে এখনো বিচার করিতে হইবে। সম্ভবতঃ আপনি বুঝিয়াছেন যে, ইংরাজকে বহিষ্কার করাই আমাদের চরম কাম্য নহে। ইংরাজেরা যদি হিন্দুস্থানী হইয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে উহাদিগকেও নিজেদের মধ্যে মিশাইয়া লইতে পারা যায়। ইংরাজ যদি নিজের সভ্যতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া এখানে থাকিতে চায় তবে এখানে তাহাদের স্থান নাই। এই রকম অবস্থা আনয়ন করা ত আমাদের নিজের হাতের ভিতরেই আছে।

পাঠক—আপনি ইংরাজকে হিন্দুস্থানী করিবার যে কথা বলিলেন উহা অসম্ভব কথা।

সম্পাদক—সে কথা বলিলে "ইংরাজ মানুষ নয়" এই কথাই বলা হয়। ইংরাজেরা এ পথে গ্রহণ করিবে কি না তাহাও আমাদের ভাবিবার দরকার নাই। আমাদের নিজেদের ঘর সাফ্ করাই আগে দরকার। সাফ্ করা হইলে উহাতে যে সব লোক থাকার যোগ্য তাহারাই থাকিবে, অপরে নিজের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়া লইবে। এই রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু আছে।

পাঠক—কোনও ইতিহাসে ত এমন কথা পড়ি নাই।

সম্পাদক—যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা কখনো হয় নাই এবং হইতেও পারে না—এ রকম মনে করা দুর্ব্বলতা। অন্ততঃ যে সকল কথা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় তাহা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক। সকল দেশের এক রকম অবস্থা হয় না। কিন্তু হিন্দুস্থানের অবস্থা বিচিত্র। তাহার ভিতর অপরিমেয় শক্তি আছে। তাই অন্য

দেশের ইতিহাসের সহিত আমাদের তুলনাও চলে না। আমি আপনাকে দেখাইয়ছি যে, অন্য সভ্যতার যখন রং বদলাইয়া গিয়াছে তখনও হিন্দুস্থানী সভ্যতার গায়ে আঁচর লাগে নাই।

পাঠক—এ সকল কথা আমার কাছে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ইহার মধ্যে সন্দেহ কমই আছে যে, ইংরাজদের লড়াই করিয়াই বাহির করিয়া দিতে হইবে। তাহারা এখানে থাকিলে আমাদের স্বোয়াস্তি মিলিবে না। একথা ত জানা কথা যে, পরাধীন ব্যক্তির স্বপনেও সুখ নাই। তাহারা থাকাতেই আমরা শক্তিহীন হইয়া আছি, আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং আমাদের দেশের লোককেও নগণ্য বলিয়া বোধ হয়। তাহারা আমাদের দেশে যমের মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকে বিদায় করাতেই আমাদের কল্যাণ।

সম্পাদক—আপনি আপনার উত্তেজনায় আমার সকল কথ ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরাই ইংরাজকে আনিয়াছি, আর আমরাই থাকিতে দিতেছি। তাহাদের সভ্যতা আমাদের নিজের করিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই যে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে, একথা আজ আপনি কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলেন ? তাহাদের উপর আপনার যে ঘৃণা, তাহ হওয়া উচিত তাহাদের সভ্যতার উপর। কিন্তু যদি মানিয়াও লওয় যায় যে, লড়াই করিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব তাহারই ব উপায় কি ?

পাঠক—যেমন ইটালী করিয়াছিল। ম্যাজিনী আর গ্যারীবল্ডি যাহা কিছু করিয়াছেন আমরাও তাহা করিতে পারি। তাঁহারা যে মহাপুরুষ ছিলেন তাহা ত আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইটালী ও হিন্দুস্থান

ইটালীর উদাহরণ দিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন। ম্যাজিনী মহাত্মা পুরুষ ছিলেন। গ্যারীবল্ডীও বড় যোদ্ধা ছিলেন। উভয়েই পূজ্য ব্যক্তি। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি। তবুও হিন্দুস্থানের ও ইটালীর অবস্থায় পার্থক্য আছে। প্রথমে ত গ্যারীবল্ডী ও ম্যাজিনীতে কি প্রভেদ তাহা জানা দরকার। ম্যাজিনীর উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। ম্যাজিনী যাহা চাহিয়াছিলেন ইটালীতে তাহা হয় নাই। ম্যাজিনী মনুষ্যের কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক মনুষ্যকেই নিজের উপর আধিপত্য করিতে শেখা চাই। ইটালিতে ইহা স্বপনের মতই অপ্রাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। ম্যাজিনী ও গ্যারীবল্ডীর আদর্শের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ তাহা স্মরণ রাখিবেন। গ্যারীবল্ডী সমস্ত ইটালীয়ানকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়াছেন. প্রত্যেক ইটালিয়ানও অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। ইটালী ও অষ্ট্রিয়া এই উভয়ের সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে উভয়ের সম্বন্ধ ছিল খুড়ো ভাইপো এই রকমের। আদর্শ ছিল কীলের পরিবর্ত্তে ঘুষি চালানো। ইটালীকে অপরের কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত করাই গ্যারীবল্ডীর মোহ ছিল। সেই হেতু কাভুরের বুদ্ধিতে ইটালী যে পথ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে ইটালীর গৌরব খর্ব্বই হইয়াছে—বাড়ে নাই। আর ইহার শেষ ফলই বা কি? আপনি যদি একথা বলেন যে. ইটালীতে ইটালীয়ানরা রাজত্ব করিতেছে

এবং তাহাতেই ইটালীর প্রজা সুখী হইয়াছে তাহা হইলে আমি বলিব আপনি অন্ধকারে ডুবিয়া আছেন। ম্যাজিনী অত্যন্ত সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন যে, ইটালী মুক্ত হয় নাই। ভিক্টর ইমান্যুয়ালের নিকট স্বাধীনতার অর্থ এক, আর ম্যাজিনীর নিকট ছিল অন্য রকম। ইমানুয়াল, কাভুর, এমন কি গ্যারীবল্ডীর কাছেও ইটালী বলিতে বুঝাইত—ইমান্যুয়াল, অথবা ইটালীর রাজা ও তাহার অনুচরবর্গ। ম্যাজিনীর কাছে ইটালীর লোক ও তাহার কৃষকবর্গই ছিল ইটালী; আর ইমান্যুয়াল ইত্যাদি ছিলেন ইটালীর ভৃত্য। ম্যাজিনীর ইটালী আজিও দাসই আছে। দুই রাজার শতরঞ্চ খেলা হইতেছিল। ইটালীর প্রজারা ছিল ঘুঁটি। আজিও তাহাদের সে অবস্থার নড় চড় হয় নাই। ইটালীর মজুরেরা আজও দুঃখী। ইটালীর শ্রমিকদের অভিযোগ শোনা হয় নাই, এই জন্য তাহারা খুন করে, রাজদ্রোহ করে, মাথা ফাটায়। উহাদের পক্ষে বিদ্রোহী হওয়ার ভয় এখনো আছে। সুতরাং ইটালী অষ্ট্রিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ায় লাভ কি হইয়াছে? লাভ ত নামে মাত্র। যে পরিবর্ত্তনের জন্য যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা হয় নাই। প্রজার দশা বদলায় নাই।

হিন্দুস্থানেরও এই দশা হয়, ইহা হয়ত আপনি চাহিবেন না; আমি জানি যে, আপনার ইচ্ছা হিন্দুস্থানের কোটি কোটি গরীব লোকের সুখ হোক্। আপনি আর আমি রাজ্য-পাট লই, এই ইচ্ছা আপনার নাই। যদি তাই হয় তাহা হইলে আমাদের একটা কথাই বিচার করিতে হইবে। সে কথাটি এই যে, প্রজা কি করিয়া স্বাধীন হয়, কি করিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি পায়।

আপনি স্বীকার করিবেন যে, কত দেশী রাজ্যে প্রজাকে পীড়ন

করা হয়। দেশী রাজা অন্যায় পূর্ব্বক প্রজার অনিষ্ট করিয়া থাকেন। ইংরাজের চাইতে তাঁহাদের জুলুম বেশী। যদি ঐ রকম দেশী রাজ্য আপনার পছন্দ হয়, তবে আমাদের দুইজনের মতের অমিল ঘুচিবে না।

আমার স্বদেশ প্রেম একথা আমাকে শিখায় না যে, প্রজার উপর দেশী রাজ্যে যে অত্যাচার হইতেছে তাহা চলিতে থাকুক। যদি আমার শক্তি হয় তবে আমি দেশী রাজার বিরুদ্ধে লড়িব। স্বদেশ প্রেম মানে আমি দেশের হিত বুঝি। যদি দেশের হিত ইংরাজের হাত দিয়া হইত তবে আমি ইংরাজের নিকট নত শির হইতাম। যদি কোনও ইংরাজ হিন্দুস্থানের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তাহার অত্যাচার দূর করিবার জন্য, দেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তবে সে ইংরাজকে আমি হিন্দুস্থানীর মতই অভিনন্দিত করিব।

হিন্দুস্থান যদি ইটালীর মত অস্ত্র-শস্ত্র পায়, তবে সে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিতে পারে—মনে হয় এই মহাভারত পর্ব্বের কথা আপনি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। ইংরাজ গোলা বারুদে যে একেবারে তৈয়ারী হইয়া আছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, উহাদের সঙ্গে লড়িতে হইলে উহাদের সমান করিয়াই হিন্দুস্থানের অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইতে হইবে। সে ভাবে সজ্জিত হইতে হইলে তাহার জন্য কত বৎসর লাগিবে? তাহাছাড়া হিন্দুস্থানকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত করার মানে ত হিন্দুস্থানকে ইউরোপ বানাইয়া ফেলা। তাহা যদি হয়, যেমন ইউরোপের দুর্দ্দশা হইয়াছে হিন্দুস্থানেরও তাহাই হইবে। সংক্ষেপতঃ ইহার মানে, হিন্দুস্থানকে ইউরোপের সভ্যতাই মানিয়া লইতে হইবে। তাহাই যদি আমরা চাই, তবে ইউরোপীয় সভ্যতায় যাঁহারা অভিজ্ঞ আমাদের ভিতর তাঁহাদেরই

আমদানী করিতে হয়। তাহার পর কতকগুলি অধিকারের জন্য লড়াই আরম্ভ হইবে, যাহা পাওয়া যায় তাহাই আদায় করিয়া লইতে হইবে এবং এমনি করিয়া আমাদের দিন কাটিবে। কিন্তু হিন্দুস্থানের জন-সাধারণ কখনও সকলে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত হইবে না এবং হওয়াও সঙ্গত নয়।

পাঠক—আপনি অনেকটা বাড়াবাড়ি করিতেছেন। সকলের অস্ত্র-শস্ত্র লওয়ার দরকার নাই। প্রথম প্রথম আমরা কিছু খুন করিয়া ভয় দেখাইব। তারপর কিছু লোক তৈয়ারী হইলে সাম্না সাম্নি যুদ্ধ করিব। ইহাতে সম্ভবতঃ ২০।২৫ লক্ষ হিন্দুস্থানীর জীবন যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে আমরা আমাদের দেশকে উদ্ধার করিতে পারিব। আমরা গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া ইংরাজকে হারাইয়া দিব।

সম্পাদক—আপনার মতে চলিলে হিন্দুস্থানের পবিত্র ভূমিকে দানব-পুরীতে পরিণত করিতে হইবে। খুন জখম করিয়া হিন্দুস্থানকে স্বাধীন করিবার কল্পনায় আপনার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় না? খুন যদি হইতে হয়, আমাদের নিজেদেরই হইতে হইবে। অপরকে খুন করিবার কল্পনা ত কাপুরুষতা। হত্যার দ্বারা আপনি কাহাকে মুক্ত করিবেন? হিন্দুস্থানের জনসাধারণ এখনো ইহা চায় না। আপনার ন্যায় যাঁহারা মিথ্যা সভ্যতার নেশায় মশ্‌গুল হইয়া আছেন তাঁহারাই এই রকম মতের ফেরে পড়িয়া থাকেন। খুন করিয়া যে রাজ্য পাওয়া যাইবে তাহার প্রজারা ত সুখী হইতে পারিবে না। ধীংরা যে খুন করিয়া-ছিলেন, হিন্দুস্থানে অন্য যে সকল খুন হইয়াছে তাহাতে লাভ হইবে বলিয়া যদি মনে করেন, তবে আপনি ভুল করিতেছেন। ধীংরাকে দেশ-প্রেমিক বলা যায়, কিন্তু তাঁহার প্রীতি ছিল অন্ধ। তিনি

নিজের শক্তিকে ভুল পথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার পরিণাম কখনো ভাল হইতে পারে না।

পাঠক - কিন্তু আপনাকে ইহা ত মানিতেই হইবে যে, ইংরাজ এই খুনের জন্যই ভয় পাইয়াছিল, এবং লর্ড মর্লে যাহা কিছু দিয়াছিলেন ঐ ভয়েই দিয়াছিলেন।

সম্পাদক—ইংরাজ যেমন ভীরু তেমনি বীরও বটে। ইহা আমি মানি যে, গোলা বারুদের ফল উহাদের উপর শীঘ্রই হয়। হইতে পারে লর্ড মর্লে যাহা কিছু দিযাছেন ভয়েই দিয়াছেন। কিন্তু ভয় দেখাইয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা ততদিনই থাকিবে যতদিন ভয় থাকিবে।

ষোড়শ অধ্যায়

গোলা বারুদ

পাঠক—ভয় দেখাইয়া পাওয়া জিনিষ ততদিন টিকিয়া থাকিতে পারে যতদিন ভয় দেখান যায়, ইহা আপনার নূতন সিদ্ধান্ত। যাহা পাওয়া গেল তাহা ত পাইলামই। তাহার আবার এদিক ওদিক কি করিয়া হইবে ?

সম্পাদক—তাহা নয়। ১৮৫৭ সালের ঘোষণা পত্র বিপ্লবের পর শান্তি স্থাপনের জন্যই বাহির করা হইয়াছিল। যখন শান্তি স্থাপিত হইল, লোক সোজা হইয়া গেল তখন উহার অর্থ বদলাইয়া গেল। যদি আমি সাজার ভয়েই চুরি না করি, তবে যখন সাজার ভয় চলিয়া যাইবে, তখন পুনরায় চুরি করিবার ইচ্ছা হইবে, আর চুরি

করিবও বটে। ইহা ত অত্যন্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়, সুতরাং অস্বীকার করারও উপায় নাই। আমরা ধরিয়া রাখিয়াছি যে, জবরদস্তি করিয়া লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করা যায়, তাই আমরা জোরও প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি।

পাঠক—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ত আপনারই বিরুদ্ধে যায়। আপনাকে মানিতে হইবে যে, ইংরাজেরা যাহা কিছু নিজেরা পাইয়াছে তাহাও মারপিট করিয়াই পাইয়াছে। আপনি অবশ্য একথাও বলিয়াছেন যে, ইংরাজেরা যাহা কিছু পাইয়াছে তাহা কোনও কাজের জিনিষ নয়। সে কথা আমার স্মরণ আছে। কিন্তু তাহাতেও আমার যুক্তি উল্টাইয়া দেওয়া যাইবে না। তাহারা নিষ্প্রোয়জনীয় জিনিষই চাহিয়াছিল আর পাইয়াছেও তাহাই। কিন্তু কথা ত তাহা নহে। কথা হইতেছে এই যে, তাহারা নিজের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে। নিজের উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে তাহা যে প্রকারেই সিদ্ধ হোক্ না কেন, তাহাতে ক্ষতি কি? মারপিট করিয়া উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেই বা দোষ কি? ঘরে যখন চোর ঢোকে তখন কি আমরা ভাল-মন্দ উপায়ের বিচার করি? আমার ধর্ম্ম তখন উহাকে বাহির করিয়া দেওয়া—তাহা যেমন করিয়াই হোক্ না কেন। এ কথা বোধ হয় আপনি মানেন যে, ভিক্ষা করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, পাওয়া যাইবেও না। তবে আমরা কি করিয়া লইব? আমরা পশুবল প্রয়োগ দ্বারা জবরদস্তী করিয়াই লইব এবং যতদিন আবশ্যক হইবে বল-প্রয়োগ দ্বারাই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিব। ছোট ছেলে যদি আগুনে পা দিতে যায়, তবে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার উপর বল প্রয়োগ করা নিশ্চয়ই আপনি খারাপ বলিয়া মনে করেন না। যেমন করিয়াই হোক্ আমাদের কার্য্য হাসিল করিয়া লওয়া চাই।

সম্পাদক—আপনি এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা বহিদৃ ষ্টিতে ঠিক বলিয়া মনে হয়। অনেকেই এই যুক্তির মিথ্যা আশ্রয়ে পড়িয়া আছে। আমিও পূর্ব্বে এই রকম ভাবেই বিচার করিতাম। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং ভুল দেখিতে পাইতেছি। আপনাকেও আমি সাবধান করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে এই যুক্তিই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ যে, উহারা যেমন পশুবল প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইয়াছে. আমাদিগকেও তেমনি পশুবল প্রয়োগ করিয়াই কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। ইংরাজেরা মারামারি করিয়াছে, আমরাও উহা করিতে পারি—এ কথা ঠিক। কিন্তু তাহারা মারামারি করিয়া যে দ্রব্য পাইয়াছে, মারামারি করিয়া আমরাও সেই ধরণেয় জিনিষই পাইব। আপনি ত এ কথা মানিবেন যে, সে ধরণের জিনিষের আমাদের প্রয়োজন নাই। আপনি সাধন ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করেন না। ইহা অত্যন্ত ভুল। এই ভুল বশতঃ যাঁহাদিগকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া মানা যায় তাঁহারাও দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন। এরূপ করা এবং বাবলা গাছ পুঁতিয়া আম খাওয়ার ইচ্ছা করা প্রায় একই রকমের জিনিষ। নদী পার করার উপায় হইতেছে নৌকা। গাড়ীতে বসিয়া যদি নদী পার হইতে চাই, তাহা হইলে গাড়ীও ডুবিবে আমিও ডুবিব।

যেমন দেবতা তেমনি তাহার পূজা, একথা খুবই ঠিক। ইহার ভুল অর্থ করিয়াই লোকে ভুল পথে চলে। সাধন হইতেছে বীজ আর সাধ্য হইতেছে বৃক্ষ। অতএব যে সম্বন্ধ বীজ ও বৃক্ষে আছে সেই সম্বন্ধ সাধ্য ও সাধনে আছে। শয়তানকে ভজনা করিয়া যদি ঈশ্বর ভজনার ফল চাই, তাহা কি কখনও পাওয়া যাইতে পারে?

সেই জন্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল ঘোর অজ্ঞতা-বশতঃই এ কথা বলা চলে—আমার ঈশ্বর ভজন করা দরকার, তাহার উপায় যদি শয়তানী হয় তবে তাহাতে কিছুই যায় আসে না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ইংরাজেরা মারামারি করিয়া ১৮৩৩ সালে ভোট দেওয়ার অধিকার বাড়াইয়া লইয়াছিল। কিন্তু পাশবিক বল-প্রয়োগ করিয়া কি তাহারা নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অধিক অবহিত হইতে পারিয়াছে? মতলব ছিল ভোট দিবার অধিকার পাওয়া। তাহা তাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াই পাইয়াছিল। সত্যিকার অধিকার ত কর্ত্তব্য পালনের ফল; তাহা তাহারা পায় নাই। পরিণাম এই হইয়াছে যে, সমস্ত অধিকার পাওয়াই তাহাদের ব্যর্থ হইয়াছে। কর্ত্তব্য উল্টাইয়া গিয়াছে। যেখানে সকলেই দাবীর কথা বলে সেখানে কে কাহাকে কি দিবে? আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, তাহারা কোন কর্ত্তব্যই পালন করে না। কিন্তু এই বলি যে, তাহাদের যাহা আবশ্যক তাহা চাহিয়াছিল এবং পাইয়াছিল এবং পাইয়া যে কর্ত্তব্য পালন করা দরকার তাহা করে নাই; তাহারা যাহা চাহিয়াছিল তদনুযায়ী নিজেদের সাধনের যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই। সুতরাং অধিকার তাহাদের গলার ফাঁসী হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। তাহারা যাহা পাইয়াছিল তাহা তাহাদের সাধনার উপযুক্ত ফল বলা যাইতে পারে। আমার যদি আপনার ঘাড় জোর করিয়া লওয়াই মতলব হয়, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অকারণ মারামারি বাধাইতে হইবে। কিন্তু যদি আপনার ঘড়িটাকে কিনিতে চাই, তাহা হইলে আমাকে তাহার মূল্যই দিতে হইবে। যে বস্তু ভিক্ষা দ্বারা লইতে হইবে তাহার জন্য খোশামোদ করা দরকার। পাওয়ার জন্য আমি যে সাধন প্রয়োগ করিব সেই

অনুসারে উহা চোরাই মাল, কেনা মাল বা দানের দ্রব্য হইবে। তিন প্রকার বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা তিন রকমের ফল পাওয়া যায়। এখনও আপনি কি বলিবেন যে, উপায় বা সাধন সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার নাই।

আপনার চোরকে বাহির করিয়া দেওয়ার উদাহরণ লওয়া যাক্। আপনার একথা আমি মানি না যে, চোরকে বাহির করিবার জন্য যে কোনও উপায় বা সাধন প্রয়োগ করা যায়।

যদি আমার পিতা চুরি করিতে আসেন, তবে আমি এক উপায়ে কাজ করিয়া লইব। কোনও পরিচিত ব্যক্তি যদি আসে তবে পিতার বেলায় যে উপায় ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে কাজ হইবে না। কোনও অপরিচিত লোক যদি চুরি করিতে আসে তবে তৃতীয় কোনও উপায় অবলম্বন করিব। আপনি হয়ত ঐ অপরিচিত চোর যদি শ্বেতাঙ্গ হয়, তবে এক উপায়, আর হিন্দুস্থানী হইলে অন্য উপায় গ্রহণ করিতে বলিবেন। যদি কোনও ছোকরা চুরি করিতে আসে তবে আমি সম্পূর্ণ অন্য পথ লইব। যদি ঐ ব্যক্তি আমার সহিত জোরে সমান হয় তবে একরকম পথ লইব, আর যদি সে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে, তাহার গায়ে জোর বেশী থাকে তবে চুপচাপ শুইয়া থাকিব। এইরূপ পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া বলবান চোরের জন্য বিভিন্ন পন্থায় কার্য্য করিতে হইবে। বাপ যদি চোর হন তবে সম্ভবতঃ শুইয়াই থাকিব। বলবান অস্ত্রধারী চোর হইলেও আমাকে ঐ পথই অবলম্বন করিতে হইবে। পিতার ভিতরেও বল আছে, অস্ত্রধারী চোরের ভিতরেও বল আছে। উভয়েরই বলের বশীভূত হইয়া আমি আমার মাল চুরী হইতে দিব। পিতার বল আমার মনে দয়ার ভাব জাগাইবে। অস্ত্রের বল আমার মধ্যে ক্রোধের

ভাব উপস্থিত করিবে এবং আমি ঐ ব্যক্তির বিষম শত্রু হইয়া যাইব। এমনি বিচিত্র অবস্থা। এই উদাহরণে উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে আমরা দুইজনে একমত না হইতে পারি। আমার কাছে ত সকল চোর সম্বন্ধেই কি করিতে হইবে তাহা জানা আছে। তবে সেকথা শুনিলে আপনি ভয় পাইবেন, সেই জন্য সে বিচার এখানে তুলি নাই। যদি পারেন বুঝিয়া লইবেন, আর যদি নাও বুঝেন ক্ষতি নাই। কিন্তু একথা ঠিক যে, সব সময়েই বিভিন্ন পথ লইয়া আপনাকে আপনার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। চোরকে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য ইচ্ছানুরূপ উপায়ই সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। আর সাধন যেমন হইবে ফলও তেমনি হইবে। আপনার ধর্ম্ম ইহা নয় যে, যেমন করিয়া পারি চোরকে বাহির করিয়া দিব।

এখন আর একটু আলোচনা করা যাক্। এই অস্ত্রধারী চোর ধরুন, আপনার দ্রব্য চুরি করিয়াছে। কিন্তু আপনি ত ইহা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, চোর তাড়াইবার জন্য যে-কোনও উপায় অবলম্বন করা যায় না এবং উপায়ও যেমন বাছিয়া লওয়া হইবে ফলও তেমনি হইবে। সুতরাং যেমন করিয়াই হোক্ চোর তাড়াইতে হইবে ইহাই আপনার ধর্ম্ম নহে।

এইবার যে অস্ত্রধারী চোর আপনার জিনিষ চুরি করিয়া লইয়াছে তাহার কথা ধরুন। আপনি তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছেন, আপনার ক্রোধ হইয়াছে। ঐ বদমাইশকে দণ্ড দেওয়া দরকার, নিজের জন্য না হোক্, সংসারের ভালর জন্যই দণ্ড দেওয়া দরকার। আপনি কতকগুলি লোক জমা করিলেন এবং উহার বাড়ীতে গিয়া চড়াও করিলেন। চোর আপনার আগমনের কথা জানিতে পারিয়া বাড়ী ছাড়িয়া পালাইয়া গেল। তারপর সেও চটিয়া গিয়া কতকগুলি লাঠিয়াল একত্র করিয়া

শোধ লইবার জন্য দিন-দুপুরে আপনার বাড়ী লুটিবার আয়োজন করিতে লাগিল। আপনার বল আছে, আপনি উহাতে ভয় পাইলেন না। আপনি নিজে তৈয়ারী হইতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে তাহারা আপনার প্রতিবেশীদের বাড়ী লুটিতে আরম্ভ করিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া আপনার নিকট নালিশ করিতে লাগিল। আপনি বলিলেন—আমি ত আপনাদের জন্যই এ সব করিতেছি, নতুবা আমার নিজের জন্য ত কোনও চিন্তাই ছিল না। প্রতিবেশীরা উত্তর দিল—আগে ত উহারা আমাদের উপর অত্যাচার করিত না; আপনি যখন হইতে লড়াই আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই ত এই সব আরম্ভ হইয়াছে। তখন আপনার সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা হইল। গরীবের দুঃখে দয়া হয়, তা ছাড়া তাহাদের কথাও সত্য। এখন করা যায় কি? দস্যুদের নিকট হার মানিলে নাক কাটা যায়। কিন্তু কেহ কি নিজের নাক কাটিতে দিতে চায়? ও জিনিষটা সকলেরই প্রিয়। তাই আপনি গরীব-দিগকে বলিলেন—ভাই, আমার টাকা-পয়সা তোমরা লও, আমি তোমাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র দিই, অস্ত্র চালানো শিখাইয়া দিই, বদমাইশ-দিগকে মারো, ছাড়াছাড়ি নাই। এমনি করিয়া লড়াই বাড়িয়া গেল। দস্যুদের দলও বাড়িতে লাগিল। লোকের মাথার উপর এক মহা-বিপদ ঘনাইয়া আসিল। চোরকে সাজা দেওয়ার চেষ্টা করিতে গিয়া লাভ হইল এই যে, যেখানে শান্তি ছিল সেখানে অশান্তি উপস্থিত হইল। আগে মৃত্যু আসিলে তবে লোকে মরিত; এখন মৃত্যু দিন-রাত মাথার উপর নাচিয়া ফিরিতে লাগিল—এই আসে তো এই আসে। যাহারা সাহসী ছিল তাহাদের সাহস ফুরাইতে লাগিল। এই উদাহরণ আমি যে বাড়াইয়া বলি নাই, আপনি ধীরভাবে বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই গেল চোর তাড়াইবার এক উপায়।

এখন অন্য আর একটি উপায় পরখ করিয়া দেখা যাক। আপনি মনে করিলেন যে, চোর অবুঝ। অবসর পাইয়া উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আপনি ভাবিলেন, চোরটা ত মানুষ বটে। জানি না কেন চুরি করিতেছে। কিন্তু আমার কাজ হইবে সময় উপস্থিত হইলে তাহার ভিতর হইতে চুরি করিবার আকাঙ্ক্ষাই দূর করিয়া দেওয়া। আপনার যখন মনের অবস্থা এই রকম, তখন মনে করুন, সেই ভাই-সাহেব চুরি করিতে আসিয়াছেন। আপনার রাগ হইল না। উহার উপর আপনার দয়া উপস্থিত হইল। আপনার মনে হইল যে, লোকটা দুঃখী জীব। আপনি খিড়্কীর দরজা খুলিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। আপনি শোওয়ার জায়গা বদলাইয়া লইলেন। জিনিষ-পত্র এমন করিয়া সাম্নে রাখিয়া দিলেন যে, চোরের আর খোঁজাখুঁজি না করিতে হয়। চোর মহাশয় আসিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে ভাবে এ আবার কি নূতন ঢং? মাল ত সে তখন লইয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে এই বিষয় লইয়া একটা নাড়াচাড়া চলিতে লাগিল। সে ক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল ও আপনার দয়ার কথা জানিতে পারিল তখন তাহার কষ্ট হইল ও আপনার নিকট মাফ চাহিল। আপনার জিনিষগুলিও ফিরাইয়া দিল এবং চোরের ব্যবসা ছাড়িয়া দিল আপনার একেবারে চাকর বনিয়া গেল। আপনি তাহাকে রোজগারের কোনও ভাল পথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা অন্য রকমের উপায়। আপনি দেখিতে পাইতেছেন, ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ফল হয়। আমি এই উদাহরণ দিয়া একথা বলিতে চাই না যে, সকল চোর এমনি ব্যবহার করিবে বা সকলের মনে আপনার ন্যায় দয়াভাব আছে। কেবল এই টুকুই বুঝাইতে চাই যে, ভাল ফল পাইতে হইলে

পথটাও ভাল হওয়া চাই এবং যদি সব সময়ও না হয়, তবু কোনও কোনও সময় অস্ত্রের বল অপেক্ষা দয়ার বল যে অধিক শক্তিশালী তাহাতে এতটুকুও সন্দেহ নাই। অস্ত্র চালাইলে হানি আছে, দয়ার ব্যবহারে কখনো হানি হয় না।

তারপর প্রার্থনা বা আবেদন করার কথা ধরা যাক্। যে আবেদনের পিছনে বল নাই সে আবেদনের কোন দামও নাই। একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। সে যাহাই হোক্, স্বর্গীয় রানাডে বলিতেন, অনুরোধ করাও লোক শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম উপায়। ইহা লোককে নিজের অবস্থা সম্বন্ধেও সচেতন করিয়া তোলে এবং শাসকদিগকেও সাবধান করিয়া দেয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলে আবেদন করা একেবারে নিষ্ফল নহে। বরাবর কোন লোক যদি প্রার্থনাই করিয়া যায় তবে তাহা দাস-মনোভাবের পরিচয় দেয়। যে প্রার্থনার পিছনে শক্তি আছে সেই প্রার্থনাই সর্ব্বদা প্রয়োগের যোগ্য। এই প্রকার শক্তির অধিকারী প্রার্থনার গরজ দেখাইলে উহাতে তাহার মহত্বই প্রমাণিত হয়।

প্রার্থনার পিছনে নানা রকমের শক্তি থাকিতে পারে। এক রকমের জোর এই যে, "যদি না দাও তবে তোমাকে আঘাত করিব"। ইহাই হইতেছে গোলা-বারুদের শক্তি। উহার ফল যে খারাপ তাহার বিচার পূর্ব্বে করিয়াছি। আর এক রকমের শক্তি আছে যাহা বলে—"যদি না দাও তবে আর অনুরোধ করিব না বটে; তবে তোমার সহিত আর সম্পর্কও রাখিব না।" এই বলকে দয়াবল, আত্মবল অথবা সত্যাগ্রহ বলিতে পারেন। এই শক্তির কখনও নাশ হইতে পারে না। এই শক্তি যাঁহারা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারা নিজেদের অবস্থাও ঠিক ঠিক বুঝিতে

পারেন। যাঁহার এই শক্তি আছে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্রের বল কিছুই করিতে পারে না।

তারপর ছেলে যদি আগুনে পা দেয় তবে তাহাকে আটকাইতে হইবে, এই বলিয়া জবরদস্তি করার যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাক্। পরীক্ষা করিলে, কষ্টিপাথরে উহাকে ঘসিলে, আপনিই হারিয়া যাইবেন। আপনি ছেলেদের বেলায় কি করিয়া থাকেন? ছেলে যদি এমন হয় যে, শারীরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা আপনার বাধাকে ব্যর্থ করিয়া সে আগুনের ভিতর পা বাড়ায়, তবে ত আপনি আর তাহাকে রুখিয়া রাখিতে পারেন না। আপনার কাছে তখন দুইটি মাত্র উপায় থাকে। একটি—আগুনে যাহাতে না পড়িতে পারে সেজন্য উহারই প্রাণ লওয়া, দ্বিতীয়টি—আগুনে পুড়িয়া তাহার অপমৃত্যু দেখিতে না হয়, এই জন্য আপনার নিজেরই প্রাণ দান করা। আপনি নিশ্চয়ই ছেলের প্রাণ লইবেন না; আপনার হৃদয় দয়া-ভাবে যদি পরিপূর্ণ না থাকে তবে আপনি নিজের প্রাণও দিবেন না। এমনি করিয়াই দেখানো যায় যে, ছোট ছেলের উপর আপনি অস্ত্রবল প্রয়োগ দ্বারা কোন ফল লাভ করিতে পারেন না। উহাকে যদি অন্য প্রকারে ঠেকাইতে পারেন ভাল, তবে তাহা যে অস্ত্রের বল নয়, একথা মানিয়া লইতে হইবে। ঐ বল অন্য রকমের। সে বল যে কিসের বল তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আবার দেখুন, ছেলেকে যখন আটকাইতে চান, তখন সেই ছেলের হিত করাই থাকে আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আপনি যে উহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চান, তাহাও উহারই ভালর জন্য। কিন্তু এ রকম উদাহরণ ত ইংরাজের সম্বন্ধে খাটে না।

আপনি যখন ইংরাজের উপর অস্ত্রের বল প্রয়োগ করিতে চান, তখন আপনার দৃষ্টি থাকে নিজের অর্থাৎ জন-সাধারণের স্বার্থের দিকে। ইহাতে দয়া-ভাব ত বিন্দুমাত্রও নাই। যদি একথা বলেন যে, ইংরাজ অধর্ম্মাচরণ করিতেছে; অধর্ম্ম আগুন; সেই অধর্ম্ম আগুনে ইংরাজ পুড়িয়া মারিতেছে, আর আপনি দয়া-ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইংরাজকে অস্ত্র দ্বারা ঠেকাইতে চাহিতেছেন, ইংরাজ, অজ্ঞান ছেলের মত,—তবে আপনার এই উদাহরণ অনুসারে যেখানেই মানুষ অধর্ম্ম আচরণ করিতেছে সেইখানেই আপনাকে উহা প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। আপনি ছেলের প্রাণ না লইয়া যদি নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন, এতটা সাহস যদি আপনার থাকে তবেই আপনি এ উদাহরণ যে ঠিক, একথা বলিতে পারেন। আপনার ভিতর যদি এত অপরিসীম দয়া থাকে—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি যেন, আপনি তাহা ব্যবহার করিতে পারেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

সত্যাগ্রহ—আত্মবল

পাঠক—আপনি যে সত্যাগ্রহের বা আত্মবলের কথা বলিতেছেন উহার কি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে? আজ পর্য্যন্ত কোন স্থানের জন-সাধারণ যে ঐ আত্মবলের শিখরে চড়িয়াছে এমন ত দেখা

যায় না। মার-কাট না করিলে দুষ্ট লোককে সিধা করা যায় না, ইহাই ত আজ পর্য্যন্তের অভিজ্ঞতা।

সম্পাদক—তুলসী দাসজী বলিয়াছেন যে—

ধর্ম্মমূল দয়া, পাপমূল অভিমান।
তুলসী দয়া না ছাড়িও, যব তক ঘটমে প্রাণ॥

আমার কাছে ত এই কথা বেদমন্ত্রের সমান মনে হয়। যেমন দুই আর দুই নিশ্চয়ই চার হয়, তেমনি এ কথাটাও নিশ্চিত সত্য বলিয়া আমি জানি। দয়াবলই হইতেছে আত্মবল। আর এই বলের প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। উহা যদি বল না হইত তবে পৃথিবী রসাতলে যাইত। কিন্তু আপনি যখন ইতিহাসের প্রমাণ চাহিতেছেন তখন আমাকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে ইতিহাস কাহাকে বলে?

ইতিহাস শব্দের মানে গুজরাতী ভাষায়—'এই রকম হইয়াছিল।' আপনার ইতিহাস শব্দের অর্থ যদি এই হয়, তবে আপনাকে সত্যাগ্রহের অনেক প্রমাণ দিতে পারিব। আর যে ইংরাজী শব্দের (History) অনুবাদে ইতিহাস এই শব্দ ব্যবহৃত হয়, বাদশাহী তারিখ বলিতে যাহা বোঝা যায়, আপনার ইতিহাসের অর্থ যদি তাহাই হয়, তবে সত্যাগ্রহের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। রাংয়ের খনিতে যদি আপনি রূপা খোঁজেন তবে কি করিয়া তাহা পাইবেন। এই জন্য ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে, যে-দেশের হিষ্টিরী বা ইতিহাস নাই সে দেশের লোক সুখী। হিষ্টিরীতে পাওয়া যায় কি? রাজা কেমন করিয়া খেলা করিতেন, কেমন করিয়া খুন করিতেন, কেমন করিয়া শত্রুতা সৃষ্টি করিতেন—এই সবই ত হিষ্টিরী বা ইতিহাসের বিষয়। যদি ইহাই সত্যকার

ইতিহাস হয়, পৃথিবীতে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার সমস্তখানি হয়, তবে সংসার কবে ডুবিয়া যাইত। যদি পৃথিবীর কথা যুদ্ধ দিয়াই আরম্ভ হইত, তবে আজ একজন লোকও বাঁচিয়া থাকিত না। যে সকল জাতির মধ্যে যুদ্ধ করাই অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল তাহারা সকলেই প্রায় লোপ পাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার হাব্‌সীগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহারা অষ্ট্রেলিয়া দখল করিয়াছে তাহারা হাব্‌সীদের কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে দেয় নাই। যাহাদের মূল এমনি করিয়া কাটা গিয়াছে তাহারা সত্যাগ্রহী ছিল না। বাঁচিয়া থাকিলে একদিন দেখা যাইবে যে, অষ্ট্রেলিয়ার গোরা লোক, যাহারা হাব্‌সীদিগকে মারিয়া লোপ করিয়াছে, তাহারাও লোপ পাইয়াছে। যাহারা তলোয়ার চালায় তাহাদের মৃত্যু তলোয়ারের দ্বারাই হয়। প্রবাদ আছে, ভাল সাঁতারু জলে ডুবিয়াই মরে। পৃথিবীতে যে আজিও এত লোক বাঁচিয়া আছে, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, পৃথিবী অস্ত্রের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু দয়া, সত্য ও আত্মবলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইতিহাসের প্রধান প্রমাণ ত ইহাই যে, পৃথিবীতে যুদ্ধের ধুম চলিতে থাকিলেও, লোক বাঁচিয়া থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতেছে, যুদ্ধের উপরেই উহারা বাঁচিয়া নাই। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, যুদ্ধের শক্তি ছাড়াও অন্য কোন শক্তি এই সংসারকে পরিচালনা করিতেছে।

হাজার হাজার কেন লাখো লাখো লোক পরস্পরের সহিত ভালবাসা রাখিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেছে। কোটি কোটি লোক প্রেমের বলেই কষ্ট ভুলিয়া থাকে। শত শত জাতি প্রেমে মিলিত হইয়া আছে, কিন্তু (হিষ্টরী) ইতিহাসে সে কথার উল্লেখ দেখা যায় না; হিষ্টরী তাহা উল্লেখ করিতেও পারে না। কারণ যেখানে দয়া, প্রেম বা

সত্যের প্রবাহ বন্ধ হয় সেইখানকার কথাই হিষ্টরীতে লেখা হয়। এক পরিবারে দুই ভাই ঝগড়া করিল। উহার মধ্যে একজন অপরের উপর সত্যাগ্রহ করিল। তারপর আবার তাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে লাগিল, ইহা কে খেয়াল করিয়া থাকে? যদি তাহাদের উকীলের সাহায্যে বা অন্য কারণে বৈরভাব বাড়িত, যদি অস্ত্রের জোরে বা আদালত নামক অন্য প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা লড়িত, তাহা হইলেও তাহাদের কথা ছাপার হরপে লিখিত হইত, পাড়া-পড়শী জানিতে পারিত এবং সময়ে এই ঘটনা হয় ত ইতিহাসেও স্থান পাইত। একটা পরিবারের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, সমস্ত কাল, সমস্ত স্থান, আর সমস্ত জাতির সম্বন্ধেও উহাই সত্য বলিয়া জানিবেন। পরিবারের সম্বন্ধে এক রকম, আর জাতির সম্বন্ধে অন্য রকম হয় এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। যাহা অস্বাভাবিক, ইতিহাসের পাতায় তাহারই স্থান আছে। সত্যাগ্রহ স্বাভাবিক, সেই জন্য ইতিহাসের পাতায় উহার কথা ত উঠিবে না।

পাঠক—আপনার কথায় ত মনে হয়, সত্যাগ্রহের উদাহরণ ইতিহাসে থাকিবার কথাই নয়। সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে সবিস্তারে জানিবার আবশ্যক আছে। আপনি যাহা বলিতে চাহেন তাহা যদি খুলিয়া বলেন তবে ভাল হয়।

সম্পাদক—সত্যাগ্রহ বা আত্মবলকে ইংরাজীতে 'প্যাসিভ রেজিষ্টান্স' বলে। নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য নিজে দুঃখ সহ্য করা হয় যেখানে সেইখানেই ঐ কথাটির ব্যবহার হয়। যে কার্য্যের জন্য সত্যাগ্রহ করা যায় সে কার্য্য পশুশক্তির দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি কোনও কার্য্য আমার বিবেক অন্যায় বলিয়া মনে ক

আমি যদি সে কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমার এই চেষ্টায় সত্যাগ্রহ করা হইল, অথবা আত্মবল কাজে লাগান হইল, একথা বলা যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ধরুন, সরকার এমন এক নিয়ম করিলেন যাহা আমার বিবেক অনুমোদন করে না। এই অবস্থায় যদি সরকারের বিরুদ্ধে জোর-প্রয়োগ করিয়া ঐ আইন আমি রদ করাই, তাহা হইলে উহাতে আমার শরীরের বল প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু যদি আমি ঐ আইন স্বীকার না করি, আর সেজন্য নির্দ্দিষ্ট সাজা স্বেচ্ছায় বরণ করি, তবে আমি প্রয়োগ করিলাম আত্মিক বল। তাহাই সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহে আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিই।

কাহারও সহিত শত্রুতা করা অপেক্ষা নিজের জীবন উৎসর্গ করা যে ভাল, একথা ত সকল লোকেই মানিয়া থাকেন। তাছাড়া সত্যাগ্রহ যুদ্ধ যদি অসঙ্গত কারণে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে কেবল সত্যাগ্রহীই দুঃখ ভোগ করে, অর্থাৎ নিজের ভুলের সাজা সে নিজেই গ্রহণ করে। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যে ক্ষেত্রে লোক ভুল করিয়া সত্যাগ্রহ করিয়াছে। কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না যে, অমুক কার্য্য নিশ্চয়ই খারাপ। কিন্তু যখন কোনও কার্য্য কাহারও কাছে খারাপ লাগে তখন তাহার পক্ষে সে কার্য্য ত খারাপ বটেই, আর সেই সময় ঐ খারাপ কার্য্য না করিয়া উহার জন্য দুঃখভোগ করাই সত্যাগ্রহের চাবিকাঠি।

পাঠক—তাহা হইলে আপনি আইনের বিরোধিতা করিতেছেন, ইহা ত অসঙ্গত। আমাদিগকে সর্ব্বদা আইন-মান্যকারী জাতি বলিয়াই গণনা করা হইয়া থাকে। আমি এখন দেখিতেছি, আপনি গরমদল

হইতেও এক পা আগাইয়া গিয়াছেন। একৃষ্ট্রিমিষ্টরাও বলিয়া থাকেন যে, যে-আইন হইয়াছে তাহা মানিতে হইবে। কিন্তু আইন যদি খারাপ হয় তবে যাহারা আইন বানাইয়াছে তাহাদিগকে মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দিলেই লেঠা চুকিবে।

সম্পাদক—আমি আগে যাইতেছি, কি পাছে পড়িয়া আছি সে কথায় কিছু আসে যায় না। যাহা ন্যায় আমি তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি, আর সেই অনুসারেই চলিতে চাহিতেছি। আমরা আইন-মান্যকারী জাতি মানে ত আমরা সত্যাগ্রহী জাতি। যদি কোনও আইন পছন্দ না হয়, তাহা হইলে আমরা আইনকারকদিগের মাথা ফাটাই না, পরন্তু অপছন্দ আইন তুলিয়া দিবার জন্য নিজেরা কষ্ট সহ্য করি। আজকাল ইহাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, আইন হইলেই আমরা তাহা মানিয়া লইতেছি; পূর্ব্বে এ রকম ছিল না। যে আইন অন্যায় মনে হইত পূর্ব্বে লোক তাহাই ভঙ্গ করিত ও তজ্জন্য সাজা ভোগ করিত।

যে আইন আমাদের বিবেকের বিরোধী তাহা মান্য করা মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এবং তাহা দাসত্বেরও চরম বলিতে হইবে। সরকার যদি বলে—তোমরা ন্যাংটা হইয়া নাচ, তাহা হইলে কি আমরা নাচিব? যদি সত্যাগ্রহী হই তবে গবর্ণমেণ্টকে বলিব যে, এই নিয়ম আপনি আপনার ঘরে বসিয়া পালন করুন, আমি ন্যাংটাও হইব না, নাচিবও না। কিন্তু আজ আমরা এমন অসত্যাগ্রহী হইয়া গিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট যদি হুকুম দেয় তবে ন্যাংটা হইয়া নাচা কেন, তাহা অপেক্ষাও নোংরা কাজ করিয়া ফেলিতে পারি।

যে মানুষের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন তিনি

কখনও আর কাহাকেও ভয় করেন না। তাঁহাকে মানুষের তৈরী কোনও নিয়মই বাঁধিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টও একথা বলে না যে, তোমাকে এই কার্য্য করিতেই হইবে; সে বলে যদি তুমি ইহা না কর, তবে তোমার সাজা হইবে। আমরা অধঃপতিত অবস্থায় পড়িয়া আছি বলিয়াই আইন হইলে বলি, আমাদিগকে এ আইন অনুসারে চলিতেই হইবে, উহাই আমাদের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।

যাহারা একবার একথা শিখিয়া লইয়াছে যে, যাহা অন্যায় বলিয়া মনে হয়, সে আইন মানা কাপুরুষতা, কেহই কি তাহাদের দ্বারা জুলুম করিয়া অন্যায় কাজ করাইয়া লইতে পারে? এই শিক্ষাই স্বরাজ্যের ভিত্তি। অনেক লোকে যে কথা মানিয়া চলে তাহাই অল্পসংখ্যক লোকও বাধ্য হইয়া মানিয়া লইবে, এরকম মনোভাব নাস্তিকতা হইতেই হয়। ইহা একান্ত ভুল। এমন হাজার হাজার উদাহরণ পাওয়া যাইবে, যেখানে অনেক লোক যাহা বলিয়াছে তাহা অসত্য প্রমাণিত হইয়াছে, আর অল্প লোক যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানেই কোনো সংস্কার হইয়াছে সেইখানেই অল্প সংখ্যক লোক অধিক লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহা করিয়াছেন। ঠগের গ্রামে অধিক লোকই বলিবে—ঠগীর বিদ্যা শিক্ষা করা চাই; তাই বলিয়া যদি কেহ সাধু থাকেন, তাঁহাকেও কি ঠগ হইয়া যাইতে হইবে? না তাহা কখনও নহে। অন্যায় আইন মানিতেই হইবে এই রকম ভুল যে পর্য্যন্ত দূর না হইবে, সে পর্য্যন্ত নিজেদের দাসত্ব কখনও যাইবে না। এই জাতীয় ভ্রম কেবল সত্যাগ্রহীই দূর করিতে পারেন। শরীরের বল বা গোলা-বারুদ দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করা সত্যাগ্রহের বিপরীত ব্যবস্থা। বল প্রয়োগের মানে এই দাঁড়ায় যে, আমার যাহা পছন্দ, আমার আশেপাশে যাহারা আছে তাহাদের

দ্বারাও তাহাই করাইয়া লইতে চাই। যদি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলে, আশেপাশের লোকও আমাকে দিয়া তাহারা যাহা চায় গোলা বারুদের সাহায্যে তাহাই করাইয়া লওয়ার অধিকারী। এ রকম করিয়া কখনো ত আমাদের অসুবিধা দূর হইতে পারে না। এ রকম করার মানে কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি বাঁধিয়া চলিতে থাকা, আর মনে করা যে, খুব আগাইয়া চলিতেছি। যদি ভাবিয়া দেখেন তবে বুঝিতে পারিবেন যে, সত্যই আমরা ঐ কলুর বলদের মত ঘানি-গাছ পরিক্রমণ করিতেছি। যিনি একথা মানেন যে, নিজের বিবেকের বিরোধী আইন মানিতে লোক বাধ্য নয়, তাঁহার পক্ষে সত্যাগ্রহই কর্ম্ম করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ বলিয়া জানিবেন; অন্য উপায় গ্রহণ করার ফল অত্যন্ত মন্দ হয়।

পাঠক—আপনার কথায় বুঝিলাম যে, সত্যাগ্রহ দুর্ব্বলের জন্য ঠিক অস্ত্র। কিন্তু দুর্ব্বল যদি সবল হইয়া উঠে তখন ত তাহারা অস্ত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

সম্পাদক—এখানে আপনি খুব ভুল করিলেন। সত্যাগ্রহই ত সব চেয়ে বড় অস্ত্র। ইহা দ্বারা তোপের জোরের অপেক্ষাও অধিকতর জোরের কাজ সাধিত হয়। তাহা হইলে ইহা দুর্ব্বলের অস্ত্র হইল কি করিয়া? সত্যাগ্রহের জন্য যে সাহস ও পৌরুষের দরকার তাহা তোপওয়ালার কাছে থাকিতেই পারে না। আপনি কি মনে করেন যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি নিজের বিবেক-বিরুদ্ধ আইন ভঙ্গ করিতে পারে? এক্সট্রিমিষ্টরা ত তোপবলের পক্ষপাতী, তবে তাঁহারা আইন মানার কথা কেন বলেন? আমি তাঁহাদের দোষ ধরিতেছি না। তাঁহারা অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু বোঝেনই না। তাঁহারাও যদি ইংরাজকে তাড়াইয়া রাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনাকে ও আমাকে

তাঁহাদেরই নিয়মের ফাঁদে বন্দী করিবেন। এবং তাঁহাদের হিসাবে উহাই ঠিক হইবে। কিন্তু সত্যাগ্রহী ত বলিবেন যে, যে-নিয়ম তাঁহাদের বিবেক-বিরুদ্ধ তাহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন না, তাহার জন্য যদি দরকার হয় ত তোপের গুলিও বুকের উপরে গ্রহণ করিবেন।

আপনি কি মনে করেন? তোপের মুখে শত শত লোককে উড়াইয়া দিতে বেশী সাহস দরকার না, তোপের মুখে হাসিতে হাসিতে মরিতে বেশী সাহস দরকার? যে মরণকে নিজের মাথার উপর লইয়া বেড়ায় সেই বীর, না যে অপরের মৃত্যু নিজের হাতে রাখে সেই বীর? যে কাপুরুষ সে একঘণ্টাও সত্যাগ্রহী থাকিতে পারে না, একথা নিশ্চয় জানিবেন। হাঁ, একথাও ঠিক যে দুর্ব্বল রোগাটে লোকও সত্যাগ্রহী হইতে পারে। একজন লোকও সত্যাগ্রহী হইতে পারে, লক্ষ লোকও হইতে পারে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও সত্যাগ্রহী হইতে পারে! ইহার জন্য সৈন্যদল তৈরী করিবার দরকার নাই। ইহার জন্য পালোয়ানের দরকার নাই। দরকার কেবল নিজের মনকে বশে আনা। নিজের মনকে যে বশে আনিতে পারিয়াছে, সে বনের রাজা সিংহের মত নির্ভয়ে চলা-ফেরা করিতে পারে এবং তাহার দৃষ্টিতেই শত্রুর বুক শুকাইয়া উঠে।

সত্যাগ্রহ এমন তলোয়ার যাহার সব দিকই ধার। উহাকে যে ভাবে খুশী কার্য্যে লাগান যায়। সত্যাগ্রহ কার্য্যে যে নিজেকে নিয়োগ করে আর যাহার বিরুদ্ধে নিয়োগ করে, ইহারা উভয়েই সুখী হয়। সে রক্তপাত না করিয়াও খুব বড় ফল লাভ করিয়া থাকে। সত্যাগ্রহ অস্ত্রে মরিচা ধরিতে পারে না। উহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না। সত্যাগ্রহীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কখনও চরমে পহুঁছাইতে পারে না। সত্যাগ্রহীর তলোয়ারের

খাপের আবশ্যক নাই। ইহার পরও সত্যাগ্রহকে যদি দুর্ব্বলের অস্ত্র বলা যায়, তবে তাহা কেবল অন্ধতা।

পাঠক—আপনি বলিয়াছেন যে, সত্যাগ্রহ হিন্দুস্থানের বিশেষ অস্ত্র : কেন? কোনও দিন কি হিন্দুস্থানে তোপের বল ব্যবহার করা হয় নাই?

সম্পাদক—আপনি জনকতক রাজাকেই হিন্দুস্থান মনে করিতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, হিন্দুস্থানের প্রাণ হইতেছে কোটি কোটি কৃষক, যাহাদের বলে আমরা আর রাজ-রাজড়ারা বাঁচিয়া আছি।

রাজ-রাজড়ারা ত অবশ্যই অস্ত্র-শস্ত্র কার্য্যে লাগাইবেন। তাঁহাদের উহাই রীতি হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কাজই ত হুকুম চালানো; কিন্তু যাহাদের উপর হুকুম চলে তাহাদের তোপের বলের দরকার নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই হুকুম মানিয়া চলে। ইহারা ইচ্ছা করিলে আত্মবল, ইচ্ছা করিলে অস্ত্রবল—এই দুইয়ের যে কোনও বলে শিক্ষা লইতে পারে। যেখানে জন-সাধারণ তোপবলের চর্চ্চাই করে সেখানে রাজা সমেত সমস্ত জাতিটা পাগলের মত হইয়া যায়; যেখানে হুকুম মানিয়া চলার লোক সত্যাগ্রহ শিক্ষা করে, সেখানে রাজার জুলুম তাঁহার তরবারীর অগ্রভাগ ছাড়াইয়া উঠে না। আর যাহারা হুকুম মানিবে তাহাদেরও অন্যায় হুকুম মানিবার আবশ্যক হয় না। চাষা কখনো কাহারও তলোয়ারের বশীভূত হয় নাই, হইবেও না। তাহাদের তলোয়ার চালানো শোভা পায় না, অপরের তলোয়ারের ভয়ও তাহাদের নাই। সেই জাতিই বড় এবং শক্তিমান যাহারা মৃত্যু মাথায় করিয়াই বাঁচিয়া থাকে; যাহারা মৃত্যুভয় একেবারে ত্যাগ করিয়াছে। এবং যে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়াছে, তাহার কাছে আর কোন ভয়ও আসিতে

পারে না। যে জাতি অস্ত্রবলে উন্মত্ত হইয়া আছে তাহাদের জন্য এই চিত্র অনুমাত্রও বাড়াইয়া আঁকা হয় নাই। সত্য কথা এই যে ভারতবর্ষের লোকেরা নিজের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে এবং শাসনকার্য্যে সকল সময়েই সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করিত। রাজা যখন জুলুম করেন প্রজা তখন তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়িয়া দেয়—আর ইহাই সত্যাগ্রহ। আমার একটা ঘটনা স্মরণ হইতেছে। একবার রাজস্থানের এক জায়গায় রায়তেরা রাজ-আজ্ঞাপালনে অপারগ হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করে। ফলে ভীত হইয়া রাজাকে প্রজার নিকট মাফ্ চাহিতে হইয়াছিল। তিনি নিজের হুকুম ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। যেখানে সত্যাগ্রহের বলের উপর লোক নির্ভর করে সেই স্থানেই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে এই অবস্থা নাই তাহাই পররাজ্য।

পাঠক—তাহা হইলে আপনি বলিবেন যে শরীরকে মজবুত করিবার দরকার নাই।

সম্পাদক—একথা আপনি কি করিয়া বুঝিলেন? শরীর শক্ত না হইলে সত্যাগ্রহী হওয়া কঠিন, বিশেষতঃ যিনি ভোগ-বিলাসে শরীর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার শরীরে যে মন বাস করে সেও দুর্ব্বল হইয়া যায়। আর যেখানে মনোবল নাই, সেখানে আত্মবল কি করিয়া আসিবে? আমাদের বাল্যবিবাহ, অলসতা প্রভৃতি মন্দ রীতি ত্যাগ করিয়া শরীর শক্ত করিতে হইবে। জরাজীর্ণ ও মরমর লোককে যদি একাকী তোপের মুখে যাইতে বলা হয় তাহা হইলে তাহাতে আমার হাসি পাইবে।

পাঠক—আপনার কথায় মনে হইতেছে যে, সত্যাগ্রহী হওয়া

যেমন তেমন কথা নহে। আর যদি তাহাই হইল, তবে এটাও আপনার বোঝা উচিত যে, আমরা সকলেই বা কি করিয়া সত্যাগ্রহী হইব ?

সম্পাদক—সত্যাগ্রহী হওয়া সহজ। কিন্তু যেমন সহজ, তেমনি কঠিনও বটে। আমি চৌদ্দ বৎসরের বালককে সত্যাগ্রহী দেখিয়াছি। রোগীকেও আমি সত্যাগ্রহী হইতে দেখিয়াছি। আর ইহাও দেখিয়াছি যে, শরীরে যাহার বেশ বল আছে, সাধারণের হিসাবে যে সুখী, সে ব্যক্তিও সত্যাগ্রহী হইতে পারে নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি জানি যে, যিনি দেশের ভালর জন্য সত্যাগ্রহী হইতে চান, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, দারিদ্র্য গ্রহণ করিতে হইবে, সত্যের সেবা করিতে হইবে ও তাঁহাকে সকল রকমেই নির্ভীক হইতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য এক মহাব্রত, উহা ছাড়া মন দৃঢ় হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে মানুষ নির্বীর্য্য, কাপুরুষ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। যাহার মন বিষয়-ভোগে পূর্ণ তাহার দ্বারা কোনও প্রকার বড় কর্ম্ম-প্রচেষ্টা হইতে পারে না। এই বাক্যের সত্যতা অনেক উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। এই অবস্থায় গৃহস্থ লোকের কি করা কর্ত্তব্য এ প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। যখন স্বামী এবং স্ত্রী রিপু-পরবশ হন, তখন তাঁহারা পশু-প্রবৃত্তিরই চরিতার্থ করেন। কেবল সন্তান উৎপন্ন করার জন্যই স্ত্রী-সংসর্গের বিধি আছে। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সন্তান উৎপন্ন করার ইচ্ছা কেমন করিয়া হইবে ? সংসারী থাকিয়াও সত্যাগ্রহী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারে। এই সকল কথা খোলাখুলি লেখা যায় না। স্ত্রীর সম্বন্ধে কি করা যায়, এ সকল কি করিয়া সম্ভব ইত্যাদি নানা বিচার উপস্থিত

হয়। যিনি বড় কোনও কার্য্য করিবেন তাঁহাকে এ বিষয়ের সমস্ত সমস্যা নিজেরই সমাধান করিয়া লইতে হইবে।

যেমন ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক, দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করাও তেমনি আবশ্যক। পয়সার লোভ রাখা আর সত্যাগ্রহী হওয়া, এই দুই কাজ এক সঙ্গে হইতেই পারে না। একথা দ্বারা ইহা বলিতেছি না যে, যাঁহার পয়সা আছে তাঁহাকে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু অর্থের দিক দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া চাই। সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া যদি অর্থনাশ হয় তবুও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে। বিচার কালে আমি সত্যাগ্রহকে সত্যের বল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। যদি সত্যের সেবা না করা যায়, তবে সত্যের বল কি করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই জন্য সদা সর্ব্বদা সত্য পালন আবশ্যক। যত ইচ্ছা ক্ষতি হোক্ না কেন, তথাপি সত্য ত্যাগ করিতে পারা যায় না। সত্য কাহারও শত্রুতা করিতে পারে না। সেই হেতু সত্যাগ্রহীর গুপ্ত সেনাও থাকিতে পারে না। যাঁহারা মিথ্যা বলার সম্মতি চাহেন তাঁহারা প্রশ্ন করেন যে, কাহারও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা বলা যায় কি না। যাঁহারা সত্যাগ্রহীর পথ লইতে চাহেন তাঁহাদের নিকট ঐ প্রকার সঙ্কট উপস্থিত হয় না। আর উপস্থিত হইলেও সত্যাগ্রহীর তাহাতে জড়িত হইবার আশঙ্কা নাই।

নির্ভীকতা ব্যতীত সত্যাগ্রহী এক পাও চলিতে পারে না। তাহাকে সব রকমে সকল অবস্থাতেই নির্ভয় হওয়া চাই। মুস্কিল মনে করিয়া সত্য পালনের ব্রত লঙ্ঘন করা চলে না। মাথায় যখন বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা সহিবার ক্ষমতা মানুষকে ঈশ্বরই দান করিয়াছেন। যাঁহাদের দেশের সেবা করিতে হইবে না, তাঁহাদেরও সত্যের সেবা করা দরকার। ইহা ছাড়া একথাও বুঝিতে পারা যায়

যে, যাহাদের অস্ত্রবল দ্বারা কার্য্য চালাইতে হয়, তাহাদেরও এই গুণ থাকা আবশ্যক।

কেবল ইচ্ছা করিলেই বীর হওয়া যায় না। যোদ্ধার ব্রহ্মচর্য্য পালন করা চাই, ভিখারী হওয়া চাই, আর নির্ভীক না হইলে ত সিপাহীই হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যোদ্ধার সত্য পালন করার তত আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যেখানে লোক সত্য সত্যই নির্ভয়, সেখানে মিথ্যার আবশ্যক কোথায়? সেখানে সত্য ত সহজেই আসিয়া দেখা দেয়। যখন কেহ সত্য ত্যাগ করে তখন কোনও ভয় বশতঃই তাহা করিয়া থাকে। সেইজন্য ব্রহ্মচর্য্য, দারিদ্র্য, নির্ভীকতা ও সত্যপালন এই চারিগুণ সম্বন্ধে কাহারও ভয় পাইবার হেতু নাই। অস্ত্রবলের উপর যাহাদের নির্ভর তাহাদের কতই ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে হয়, সত্যাগ্রহীর তাহা করিতে হয় না। অস্ত্রধারীর অন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহার মূলে থাকে ভয়। যখন কাহারও মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ভীকতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহার হাত হইতে তলোয়ার খসিয়া পড়ে। অস্ত্রের সাহায্যের তখন আর তাহার দরকার হয় না। একজনের হাতে এক লাঠি ছিল, সে বাঘের সাম্নে পড়িয়া গেল। অমনি সে লাঠি তুলিল। হাতে লাঠি ছিল বলিয়াই তাহার হাতও উঠিয়াছিল। ইহার পরেই বুঝিতে আ তাহার দেরী হইল না যে, নির্ভীকতার পাঠ তাহার একান্ত বাহিরের জিনিষ। সেইদিন হইতে সে লাঠি ত ছাড়িলই, সর্ব্বপ্রকা ভয় হইতেও সে মুক্ত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিক্ষা

পাঠক—আপনি এত কথা বলিলেন, কিন্তু শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ত কিছুই বলিলেন না। আমাদের শিক্ষা কম বলিয়া আমাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই অভিযোগ আছে। হিন্দুস্থানে কেহই অশিক্ষিত না থাকে, ইহাই লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। মহারাজ গায়কোয়াড় তাঁহার রাজ্যে সকলের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছেন। এই দিকে সকলের লক্ষ্য গিয়াছে। এজন্য আমি মহারাজ গায়-কোয়াড়কে ধন্যবাদ দিতেছি। এই সমস্ত পরিশ্রম কি ব্যর্থ মনে করিতে হইবে?

সম্পাদক—যদি আমরা নিজেদের সভ্যতাকে সব চাইতে ভাল বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, এই পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইতেছে। রাজা সাহেব এবং আমাদের অন্যান্য মাননীয় নেতারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নির্ম্মল বলিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্যের যে ফল হওয়া সম্ভব তাহা লুকাইয়া রাখিয়া ত লাভ নাই।

শিক্ষা কাহাকে বলে? শিক্ষার মানে যদি অক্ষর পরিচয় মাত্র হয় তবে তাহা একটা যন্ত্র বিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। যন্ত্রের দ্বারা ভাল ও মন্দ দুই-ই হইতে পারে। একই অস্ত্রদ্বারা রোগীকে আরাম করাও যায়, উহার প্রাণও লওয়া যায়। এই রকম অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা

করিয়া অনেক লোক উহার অপব্যবহার করে। যদি এ কথা ঠিক হয় তবে ইহাও ঠিক যে, অক্ষর জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হইয়াছে।

অক্ষর জ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ শিক্ষা শব্দটির ব্যবহার হয়। লিখিতে পড়িতে ও হিসাব করিতে পারাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলে। কোনও কৃষক সততার সহিত চাষের কার্য্য করিয়া উপার্জ্জন করে। তাহার সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান আছে। আপন মা বাপ স্ত্রী পুত্রের প্রতি আপনার রীতি অনুযায়ী কর্ত্তব্য জ্ঞান উহার আছে। নীতির নিয়ম সে বোঝে ও ঠিক ঠিক পালন করে। কিন্তু সে ব্যক্তি দস্তখৎ করিতে পারে না। এক্ষণে এমন লোককে অক্ষর জ্ঞান দিয়া আপনি কি করিতে চান? পড়াইয়া উহার কোন সুখ বাড়াইবেন? আপনি কি উহার হৃদয়ে উহার কুড়ে ঘর ও উহার অবস্থার প্রতি অসন্তোষ বাড়াইতে চান? তাও যদি করিতে হয় তবুও উহার অক্ষর জ্ঞান আবশ্যক নাই। পাশ্চাত্য ঝড়ে পড়িয়া আমরা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে এই বলিয়া উড়িয়া চলিতেছি।

এক্ষণে উচ্চ শিক্ষার কথা হোক্। আমি ভূগোল পড়িয়াছি। বীজগণিত শিখিয়াছি। জ্যামিতির জ্ঞান পাইয়াছি, জিওলজী বিদ্যাও মাথায় প্রবেশ করিয়াছে। এ সকলের ফল কি হইয়াছে? ইহাতে আমার বা আমার পাড়া-পড়সীর কি লাভ হইয়াছে? আমি ঐ জ্ঞান কেন পাইয়াছি? ইংরেজ পণ্ডিত হাক্স্লি বলিয়াছেন যে, "সেই লোক সত্য শিক্ষিত যাহার শরীর এমনভাবে তৈরী হইয়াছে যে, উহা তাহার ইচ্ছার বশে আছে ও আনন্দের সহিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইতে পারে। সেই ব্যক্তিই সত্যকার শিক্ষা পাইয়াছেন

যাঁহার বুদ্ধি স্বচ্ছ, শান্ত ও ন্যায়ানুগামী, সব অংশ সমান জোরালো এবং সমান ভাবে ক্রিয়াশীল। তিনিই সত্যকার শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁহার হৃদয় প্রকৃতির মুখ্য সত্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন, ... যাঁহার ইন্দ্রিয় তাঁহার মনের বশ ও বিবেকের অনুগত। যে ব্যক্তি নীচ কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করে, পরকে আপনার ন্যায় দেখে, তাঁহাকেই সত্যকার শিক্ষিত বলা যায়। কেন না তিনি প্রকৃতির নিয়মে চলিতেছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট হইতে খুব কাজ আদায় করিবে আর তিনিও প্রকৃতির নিকট হইতে খুব কাজ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।” যদি ইহাই সত্যকার শিক্ষা হয়, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, উপরে যে বিজ্ঞানাদির কথা বলিলাম উহা দ্বারা শরীর বা ইন্দ্রিয় বশে আনিবার কার্য্যে কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বলুন, আর উচ্চ শিক্ষার কথাই বলুন, তাহাতে আমাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, উহাতে মানুষ গড়িয়া উঠে না।

পাঠক—তাহাই যদি হয়, তবে আপনার কথার মাঝখানে আমি আর একটা কথা বলিতে চাই। আপনি যে এই সকল কথা আমাকে বলিতেছিলেন ইহা কিসের প্রভাবে? আপনার যদি অক্ষর জ্ঞান না থাকিত, আপনি যদি শিক্ষা না পাইতেন, তবে এই সকল কথা কেমন করিয়া বুঝাইতেন?

সম্পাদক—আপনি ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু আমারও সোজা জবাব পড়িয়া আছে। যদি আমি উচ্চ অথবা নিম্ন শিক্ষা না পাইতাম, তাহা হইলেও যে নিষ্কর্ম্মা হইয়া যাইতাম তাহা আমি মানি না। একথা বলিতেছি বলিয়াই যে নিজকে আমি সেবার কাজে লাগাইতে পারিয়াছি তাহাও ঠিক নহে। আমি সেবা করিতে চাই এবং

এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাই বলিয়াই আমি যাহা পড়িয়াছি তাহা কাজে লাগাইতে চাই। কিন্তু এই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার কোটি কোটি ভাইয়ের নিকট আমার কথা পহুঁছাইয়া দিতে পারি না। আপনার মত যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন কেবলমাত্র সেই ধরণের লোকের নিকটেই আমার শিক্ষা যাহা কিছু কাজে লাগিতেছে। ইহাতেই আমার কথা যে সত্য তাহা প্রমাণিত হয়। আমরা উভয়েই মিথ্যা শিক্ষার ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে উহা হইতে মুক্ত মনে করিতেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা আপনাদের হিত করিতে চাই এবং সেই জন্য আমাদের শিক্ষার মন্দ দিকটা আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি। তা ছাড়া অক্ষর জ্ঞান পাওয়ার সমস্ত বিষয়টাও আমি মন্দ বলি নাই। আমি কেবল এইটুকুই বলিতেছি যে, ঐ জ্ঞান আমাদের পূজা করিবার বিষয় নয়; ঐ প্রকার জ্ঞান আমাদের কামধেনু নয়। কেবলমাত্র উপযুক্ত স্থানেই ঐপ্রকার অক্ষর জ্ঞানের সার্থকতা আছে। সে উপযুক্ত ক্ষেত্র কি তাহা বলিতেছি। যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়কে বশে আনিতে পারিয়াছি, যখন আমাদের নীতিজ্ঞান দৃঢ় হইয়াছে, তখন যদি আমাদের অক্ষর জ্ঞান পাওয়ার ইচ্ছা হয়, তবেই ঐ জ্ঞান কাজে লাগানো সম্ভব। ঐ অবস্থায় আমাদের অক্ষর জ্ঞান অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইবে। যদি অক্ষর জ্ঞানের এই ব্যবহারই মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বাধ্যতা-মুলক করার আবশ্যক নাই, আমাদের পুরাণো পাঠশালার ব্যবস্থাই যথেষ্ট। যে শিক্ষায় চাল-চলন ভাল করার ব্যবস্থাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয় সেই শিক্ষাই প্রাথমিক শিক্ষা। এই ভিত্তির উপর যদি ঘর তৈরী হয় তবেই তাহা টিকিবে।

পাঠক—তাহা হইলে আমার মনে হয়, আপনি স্বরাজ্য

পাওয়ার জন্য ইংরাজী শিক্ষায় কোনও লাভ আছে বলিয়া মনে করেন না।

সম্পাদক—ইহার জবাব 'হাঁ' ও বটে 'না'ও বটে। কোটি কোটি লোককে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া ত উহাদিগকে দাসত্বে বাঁধিয়া ফেলার সামিল। মেকলে যে শিক্ষার ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন উহা আসলে দাসত্বের ভিত্তি। একথা আমি বলিতে চাই না যে, তিনি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যের ঐ রকম ফল হইয়াছে। আমরা স্বরাজের কথা অন্যের ভাষায় বলি, ইহা অপেক্ষা হীনতার অবস্থা আর কি হইতে পারে? যে শিক্ষা ইংরাজেরা নিজেরা পরিত্যাগ করিয়াছে উহাই আমরা অন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি, উহাতেই খুসী হইতেছি—ইহাও ভাবিবার বিষয়। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারা প্রতিনিয়ত পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু যে প্রথা অকাজের জানিয়া তাঁহারা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন, আমরা অজ্ঞতা বশতঃ তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। সে দেশে ত সকলেই নিজ নিজ ভাষাকে শ্রেষ্ঠতর করিবার চেষ্টা করিতেছে। ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ডের এক ছোট অংশ। যাহাতে ওয়েল্‌সের ছেলেরা ওয়েল্‌সের ভাষাই ব্যবহার করে তাহার চেষ্টা চলিতেছে। এজন্য ইংলণ্ডের চ্যান্সেলার মিঃ লয়েড জর্জ যথাসাধ্য করিতেছেন। এই অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা করুন। আমরা যদি একে অন্যকে পত্র লিখি তাহাও ভুল ভ্রান্তি-যুক্ত ইংরাজীতে লিখি। যাঁহারা ইংরাজীতে এম-এ উপাধি পান তাঁহাদেরও ইংরাজীতে ভুল থাকে। আমাদের ভাল ভাল চিন্তা আমরা ইংরাজীর সাহায্যেই প্রকাশ করিয়া থাকি। আমার মনে হয়, যদি এই রকম ভাবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা অধিক

দিন চলিতে থাকে, তবে আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়গণ আমাদের নিন্দা করিবে, উহাদের অভিশাপ আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করিবে।

এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া জাতিটাকে দাস করিয়া ফেলিয়াছি। ইংরাজীর শিক্ষার ফলেই অধর্ম্ম ও জোর-জবরদস্তি বাড়িয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত তাঁহারা সাধারণ লোককে প্রতারিত করিতে ও ভয় দেখাইতে ত্রুটি করিতেছেন না। ইহা কি কম অত্যাচার যে, নিজের দেশে যদি বিচার কার্য্য চালাইতে হয়, তবে আমাকে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে। ব্যারিষ্টার হইয়া আমি নিজের ভাষায় আমার বক্তব্য বলিতে পারিব না, আমার জন্য এক অনুবাদক আবশ্যক হইবে। ইহা যদি দাসত্বের শেষ সীমা না হয়, তবে আর কি হইতে পারে? ইহার জন্য আমি ইংরাজকে দোষ দিব না, নিজেরাই নিজেদিগকে দোষী বলিব। হিন্দুস্থানকে ত আমরা যাহারা ইংরাজী জানি তাহারাই দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। জন-সাধারণের দাসত্বের ধিক্কার ইংরাজের উপর পড়িবে না, পড়িবে আমাদের ইংরেজী-নবীশদের উপরেই।

কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, আমার জবাব 'হাঁ' ও 'না' উভয়ই বটে। 'হাঁ' কেন বলিয়াছি তাহা বুঝান হইল। এক্ষণে 'না' কেন তাহা বুঝাইতেছি। আমাদিগকে সভ্যতা রোগে এমন ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, ইংরাজী শিক্ষাকে আমরা একেবারে বাতিল করিয়া দিতে পারি না। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন, প্রয়োজন মত তাঁহারা যদি ইহা দ্বারা ভাল কার্য্য করিয়া লইতে পারেন, তবে আপত্তি নাই। ইংরাজী ভাষার জ্ঞান আমরা কতকগুলি কাজে লাগাইতে পারি যথা:—ইংরাজের সহিত ব্যবহারে, যে সকল

হিন্দুস্থানীর ভাষা আমরা বুঝি না অথচ যাঁহারা ইংরাজী লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায়, আর ইংরাজ নিজেরাই তাঁহাদের সভ্যতার প্রতি কি প্রকার বিরূপ হইয়া পড়িয়াছেন তাহাও জানিবার জন্য। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য নিজের সন্তানদিগকে প্রথমে দেশী ভাষার সাহায্যে সভ্য ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া; মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার পর দ্বিতীয় আর একটি দেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। তারপর বয়স পরিপক্ক হইলে ইচ্ছা করিলে ইংরাজী শিক্ষাও দেওয়া যায়। কিন্তু ইংরাজী ভাষা দেশে প্রচলনের জন্য ও উহার সাহায্যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজী শিক্ষার ইচ্ছা একেবারেই ছাড়িতে হইবে। আমাদের বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে যে, ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া আমরা কোন্ জ্ঞান অর্জ্জন করিব ও কোন জ্ঞান অর্জ্জন করিব না। ইহাও আলোচনা করিয়া স্থির করা দরকার যে, কোন শাস্ত্রই বা আমাদের অভ্যাস করা উচিত। এ কথা বোঝা কঠিন নহে যে, যদি আমরা ইংরাজী ডিগ্রি ইত্যাদি লওয়া বন্ধ করিয়া দেই, তাহা হইলে আমাদের শাসকেরা সচকিত হইয়া উঠিবেন।

পাঠক—তাহা হইলে কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে চাহেন?

সম্পাদক—এ বিষয় ত উপরে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আরো কিছু বেশী আলোচনা করা আবশ্যক। আমার মতে আমাদের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাই উন্নত করা চাই। নিজেদের ভাষায় আমাদের কি কি বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, সে কথা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা চলে না। ইংরাজী ভাষার আবশ্যকীয় পুস্তকগুলি দেশী নানা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। অনেক বিষয় পড়াইবার অনাবশ্যকীয় হাঙ্গামা ও ভুল ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত

হিন্দুস্থানীরই নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষা ছাড়া, যদি হিন্দু হন তবে সংস্কৃত, যদি মুসলমাম হন তবে আরবী, যদি পার্শী হন তবে ফার্সী শিখিতে হইবে। সকলেরই হিন্দী ভাষায় জ্ঞান থাকা চাই। কতকগুলি হিন্দু আরবী ও পার্শী শিখিবেন, আবার কতকগুলি মুসলমান পার্শি ও সংস্কৃত শিখিবেন। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম ভাগের লোকের অধিক পরিমাণে তামিল ভাষা জানা দরকার। সারা হিন্দুস্থানের জন্য হিন্দীই রাষ্ট্র-ভাষা হওয়া সঙ্গত। আর লেখার সময় উর্দ্দু বা নাগরী যাঁর যে অক্ষরে ইচ্ছা লিখিতে পারেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের উভয়েরই দুই রকমের অর্থাৎ উর্দ্দু ও নাগরী অক্ষরের স ও পরিচিত হওয়া আবশ্যক। যদি এইরূপ অবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারি তবেই আমাদের নিজেদের পরস্পরের ব্যবহারের মধ্য হইতে আমরা ইংরাজী ভাষকে তাড়াইবার আশা করিতে পারি।

এ সকল কাহার জন্য চাই? যে দাস হইয়া গিয়াছে তাহারই জন্য। আমাদের দাসত্বের ভিতর দিযাই দেশ শুদ্ধ লোক দাস হইয়া রহিয়াছে। আমরা মুক্ত হইলে রাষ্ট্রেরও মুক্তি হইবে।

পাঠক—আপনার ধর্ম্ম শিক্ষার কথা বড় গোল মেলে।

সম্পাদক—ঠিক বটে, কিন্তু ইহা ছাড়া চলিবে না। হিন্দুস্থান কদাচ নাস্তিক হইতে পারে না। এই হিন্দুভূমির পক্ষে নাস্তিকতার ভার দুঃসহ। বিষয় অবশ্য শক্ত। ধর্ম্মশিক্ষার বিষয় ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ দাম্ভিক ও স্বার্থান্বেষী। তবু তাঁহাদেরই দ্বারস্থ হইতে হয়। মোল্লা আর বামুনের হাতেই ধর্ম্মের চাবি রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের যদি সুবুদ্ধি না হয় তাহা হইলে ইংরেজী শিক্ষার দরুণ যে উৎসাহ আমাদের ভিতর জাগিয়াছে, তাহার

সাহায্যেই লোকের ভিতর ধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ খুব কঠিন নহে। সমুদ্রের উপকূলেই কেবল ময়লা জমিয়া গিয়াছে। এই ময়লায় যাহারা মলিন হইয়াছে, তাহাদেরই সাফ্ হওয়া দরকার। আমার সমালোচনা হিন্দুস্থানের কোটি কোটি নর-নারীর জন্য নহে। হিন্দুস্থানের আসল অবস্থায় পহুঁছার জন্য আমাদিগকেও সত্যকার স্থিতিতে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু কোটি কোটি লোক ত সত্য অবস্থাতেই রহিয়াছে। আমাদের সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি, সংস্কার ও দোষ স্বাভাবিক গতিতে হইতে থাকিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়াই একমাত্র প্রযত্ন হওয়া চাই। আর যাহা কিছু তাহা উহার সাথে সাথেই হইবে।

উনবিংশ অধ্যায়

কল কারখানা

পাঠক—আপনি পাশ্চাত্য সভ্যতা বহিষ্কার করিবার কথা বলিতেছেন। তাহা হইলে ত আপনি ইহাও বলিবেন যে, আমাদের কল-কারখানার একেবারেই আবশ্যক নাই।

সম্পাদক—আপনি এই প্রশ্ন উঠাইয়া আমার ক্ষত স্থানেই আঘাত করিয়াছেন। যখন আমি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুস্থানের আর্থিক ইতিহাস নামক পুস্তকখানা পড়িতেছিলাম তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই। আর যখনই সেই কথার বিচার করি, আমার বুক ব্যথায় ভরিয়া উঠে। এই কল-কারখানা বাড়িয়া গিয়াই ত

হিন্দুস্থানকে নষ্ট করিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার আমাদিগের যে হানি করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দুস্থানের কারিগরেরা আজ ধ্বংস-প্রায়। ইহা ম্যাঞ্চেষ্টারের দ্বারাই হইয়াছে।

কিন্তু আমার ভুল হইতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের দোষই বা কেমন করিয়া দেওয়া যায়? আমরা যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি তখনই না সে কাপড় বানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন আমি বাঙ্গলা দেশের বীরত্বের কাহিনী পড়িলাম তখন আমার আনন্দ হইল। বংলায় কাপড়ের কল ছিল না। লোকে আসল ব্যবসাটাতেই হাত দিয়াছিল। বাংলা বোম্বাইয়ের মিলগুলির সুবিধা করিয়া দিয়াছে, ইহা ঠিক। তবে বাংলা যদি কল-কারখানা একেবারেই ত্যাগ করিত তাহা হইলে আরো ভাল হইত।

কলের জন্য ইউরোপ নষ্ট পাইতেছে, আর সেই সর্ব্বনাশী হওয়াই হিন্দুস্থানেও বহিতেছে। কলই আজকালকার সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। উহা যে মহাপাপ তাহা আমি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। বোম্বাইয়ের কলে যে সব মজুর কাজ করে তাহারা একেবারে দাস বনিয়া গিয়াছে। এই সকল কলে যে সব স্ত্রীলোক কাজ করে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া বুক কাঁপিয়া উঠে। যদি মিল না থাকিত তাহা হইলে ঐ সকল স্ত্রীলোক যে না খাইতে পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিত এমন নহে। এই কলের ধূলার ঝড় যদি আরো বাড়ে, তবে সমস্ত দেশই বিপদ সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে; হিন্দুস্থানের বড়ই দুর্দ্দশা হইবে। আমার কথা অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার নিকট হিন্দুস্থানে আর মিল বাড়ানো অপেক্ষা ম্যাঞ্চেষ্টারের পচা কাপড় ব্যবহার করাও ভাল বলিয়া মনে হয়। উহাদের কাপড় ব্যবহার করিলে কেবল দেশের পয়সাই দেশের বাহিরে

যাইবে, কিন্তু যদি হিন্দুস্থানকে ম্যাঞ্চেষ্টার বানানো হয়, তাহা হইলে দেশের পয়সা দেশেই থাকিবে বটে, কিন্তু উহা আমাদের প্রাণ নাশ করিবে, আমাদের রক্ত জল করিয়া দিবে এবং আমাদের চরিত্র নষ্ট করিবে। মিলে যাহারা কাজ করে তাহাদের চরিত্রের কথা তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিবেন। যাহারা মিল বসাইয়া পয়সা রোজগার করিতেছেন, কল-কারখানার দ্বারা যাহারা টাকা জমাইয়াছেন অন্যান্য বড়লোক অপেক্ষা তাঁহাদের ভাল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমেরিকার রকফেলারের তুলনায় ভারতীয় রকফেলার ভাল হইবে এই রকম বিবেচনা করা ভুল। আজকার গরীব হিন্দুস্থান স্বাধীন হইতে পারে, কিন্তু চরিত্র নাশ করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিলে সে হিন্দুস্থানের কদাচ স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আমার ত মনে হয় যে, ইংরাজের রাজত্ব এ দেশে এই ধনীরাই টিকাইয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজেরা এখানে থাকিলেই ধনাদের স্বার্থ পূর্ণ হয়। ধনাই লোককে সত্যিকার ভিখারী বানায়। এই ধন-সম্পদ বিষে ভরা। ইহার বিষ সাপের বিষ হইতে অধিক প্রাণান্তকর। সাপে যদি কাটে তাহা হইলে এই শরীরটাই ধ্বংস হয়; কিন্তু ধন-সম্পত্তির ভিতর দিয়া যে বিষ শরীরে প্রবেশ করে, সে বিষ ধ্বংস করে দেহ, আত্মা, মন—এ সমস্তকেই। দেশে মিল বাড়িলে খুসী হওয়ার কোন কারণ নাই।

পাঠক—তাহা হইলে কি মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে?

সম্পাদক—কঠিন কথা শিকড়, একবার গড়িয়া বসিলে তুলিয়া ফেলা কঠিন। গড়িয়া ভাঙ্গার চাইতে প্রথম হইতে এ কার্য্য আরম্ভ না করাই বিজ্ঞের কাজ। মিলের মালিকের দিকে ঘৃণা ভরে চাহিবার আবশ্যক নাই; তাহাদের উপর কৃপা করাই উচিত। ইহা সম্ভব

নয় যে, তাঁহারা মিলগুলির কাজ বন্ধ করিয়া দিবেন। কিন্তু আমরা অনুরোধ জানাইতে পারি—তাঁহারা যেন আর কাজ না বাড়ান। তাঁহারা যদি সৎপথ অবলম্বন করেন, তবে ধীরে ধীরে কাজ কমাইতেই থাকিবেন। তাঁহারা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া ঘরে ঘরে সেকালের চরখা বসাইতে পারেন। আর যদি কলওয়ালারা এ কার্য্য না করেন, তবে জন-সাধারণ নিজেরাই কলের কাপড় ব্যবহার করা বন্ধ করিতে পারেন।

পাঠক—কিন্তু ইহা ত কেবল কাপড়ের বিষয়ে বলিলেন। কল হইতে কত অগণিত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। স সকল হয় বিদেশ হইতে আনিতে হয়, নয় ত তাহাদের জন্য এই দেশেই কল বসাইতে হয়।

সম্পাদক—এ কথা একেবারে ঠিক যে, আমাদের দেবতা পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর কল হইতে গড়িয়া আসে। সূচ, দে'শলাই আর লণ্ঠনের কথা ত বলাই বাহুল্য। আমার ত একই জবাব আছে, যখন কলের দ্রব্য তৈরী হইত না, তখন হিন্দুস্থান কি করিত? সে সময় যাহা করিত আজও তাহাই করিবে। যত দিন হাতে আলপিন না গড়া যায়, ততদিন আলপিন ছাড়াই কাজ চালাইব। আর লণ্ঠন সরাইয়া ফেলিব। প্রদীপে তেল ঢালিয়া আর আমাদের ক্ষেতের তুলার পলিতা করিয়া বাতি জ্বালাইব। উহাতে চোখ ভাল থাকিবে, পয়সা বাঁচিবে, স্বদেশী বজায় থাকিবে এবং এইরূপে আমরা স্বরাজ্যও লাভ করিব।

এই রকম ব্যবস্থা দেশের সকলে একযোগে করিয়া ফেলিবে, অথবা একই সময় অনেক লোক কলের দ্রব্য ত্যাগ করিবে, এরূপ অবশ্য আশা করা যায় না। কিন্তু আমার বক্তব্য যদি বিচার-সহ হয়, তাহা হইলে কোন কোন জিনিষ পরিত্যাগ করিব তাহাও

আমরা সহজেই স্থির করিয়া লইতে পারি। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত কলের দ্রব্যই ত্যাগ করা যাইবে। সর্ব্বদাই কিছু কিছু জিনিষ ত্যাগ করিতে থাকিব। অপরেও আমাদের অনুসরণ করিবে। কিন্তু এজন্য প্রথমতঃ নিজের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল করা দরকার, তারপর সেই অনুসারে কাজ করা দরকার। প্রথমে হয়ত একজনই করিবেন; তারপর হয়ত দশে দশে শতে শতে ঐ প্রকার করিবেন। মনে রাখিবেন, কাজ খুবই সহজ; তবে আমরা বসিয়া থাকিব, আর অপরকে পথ দেখাইব—ইহা হয় না। নিজেদেরই সর্ব্বাগ্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া দরকার। যিনি করিবেন না, তাঁহারই সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও এ কাজে বিরত থাকিবেন, তিনি ত কাপুরুষ।

পাঠক—ট্রামগাড়ী ও ইলেকট্রিক বাতি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

সম্পাদক—এ প্রশ্নের সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। যখন আমি রেলকেই বাতিল করিয়া দিয়াছি, তখন ট্রামের কথা আর কোথায় থাকে? কল ত সাপের বাসার মত. একটা নহে, হাজার সাপ একটার পর একটা রহিয়াছে। যেখানে কল সেইখানেই বড় সহর, সেইখানেই ট্রাম, রেলগাড়ী, এবং বৈদ্যুতিক আলোও থাকাই চাই। আপনি হয়ত জানেন যে, ইংলণ্ডেও গ্রামের ভিতর বৈদ্যুতিক আলো ও ট্রাম নাই। খাঁটি বৈদ্য ও ডাক্তার আপনাকে বলিবে, যেখানে ট্রাম ও রেলগাড়ী ইত্যাদি রহিয়াছে, সেখানে লোকের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতেছে। আমার মনে আছে যে, কোনও এক সহরে যখন অর্থের অভাব ঘটিয়াছিল, তখন ট্রাম, উকীল ও ডাক্তারের আমদানী কমিয়াছিল, আর লোকেও সুস্থ হইয়াছিল।

কলের গুণের কথা একটাও আমার মনে আসে না, কিন্তু দোষের কথা লিখিতে গেলে এক বড় পুঁথি তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

পাঠক—এ সব যাহা লিখিতেছেন তাহা ত কলের সাহায্যেই ছাপাইবেন। ইহা তবে কলের গুণ না দোষ?

সম্পাদক—ইহা বিষ দ্বারা বিষ নষ্ট করিবার একটি উদাহরণ। ইহা কলের গুণ নহে। কল মরিতে মরিতেও বলিয়া যাইতেছে যে, সাবধান হও; আমার নিকট হইতে তুমি কোন লাভই আদায় করিতে পারিবে না। কলের পিছনে যিনি পাগল হইয়া আছেন, ছাপার লাভ ত তাঁহারই পাওনা।

কিন্তু কথাটা ভুলিবেন না। কল যে একটা খারাপ জিনিষ এ কথা মনে গভীরভাবে আঁকিয়া রাখিবেন। তারপর ধীরে ধীরে কলের মোহ কাটাইয়া উঠিবেন। প্রকৃতি এমন রাস্তা করিয়া রাখেন নাই যে, ইচ্ছামাত্রই কোনও দ্রব্য তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। যখন কলকে আমরা খারাপ বলিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করিব, তখনই কল লোপ পাইবে।

বিংশ অধ্যায়

উপসংহার

পাঠক—আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, আপনি তৃতীয় একদল খাড়া করিতে চাহেন। আপনি দেখিতেছি গরম দলেরও নহেন, নরম দলেরও নহেন।

সম্পাদক—আপনি ভুল করিতেছেন। আমার মনে তৃতীয় দল গড়িবার কোনও ইচ্ছা নাই। সকলকার বিচার এক রকম হয় না। এমন কি নরম দলের সকলের বিচারও এক রকম হয় না। যাহার কার্য্য সেবা করা তাহার আবার পক্ষ কোথায়? আমি যেমন নরম দলের সেবক, তেমনি গরম দলেরও সেবক। যেখানে যাঁহাদের সহিত মতভেদ হয়, সেখানে সবিনয়ে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করি এবং নিজে নিজের কার্য্য করিয়া যাই।

পাঠক—আর যদি আপনাকে দুই দলকেই বলিতে হয় তখন?

সম্পাদক—গরমদলওয়ালাকে বলিব য, আপনি ত হিন্দুস্থানে স্বরাজ্য চাহেন। কিন্তু স্বরাজ্য চাহিলেই পাওয়া যাইতে পারে না, স্বরাজ্য সকলের নিজের শক্তিতে অর্জ্জন করিয়া লইতে হয়। আমার কাছে অপরের দেওয়া স্বরাজ্য স্বরাজ্যই নহে—উহা পর-রাজ্য। এই জন্য আপনি যদি ইংরাজদিগকে উড়াইয়া দিয়া মনে করেন যে, আপনি স্বরাজ্য পাইয়াছেন, তবে তাহা ঠিক হইবে না। স্বরাজ্য সত্যকার কি তাহা আমি এতক্ষণ বলিয়াছি। ঐ প্রকার স্বরাজ্য আপনি গোলা-বারুদ দ্বারা পাইতে পারেন না। গোলা-বারুদ হিন্দুস্থানের পক্ষে অনাবশ্যক। এই জন্য সত্যাগ্রহের উপরই ভরসা রাখিবেন। মনের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা আনিবেন না যে, আমাদের স্বরাজ পাওয়ার জন্য গোলা-বারুদের দরকার আছে। নরমদলওয়ালাকে বলিব—আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আমাদের হীনতারই পরিচয়। উহার দ্বারা আমরা কেবল নিজেদের দৈন্যকেই স্বীকার করি। আমাদের ইংরাজের সহিত সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করার মানে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়া দাঁড়ান। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের আর কাহাকেও আবশ্যক আছে একথা ত বলা চলে না। যদি একথাও মনে করেন

যে, এখন ইংরাজ নহিলে আমাদের চলিবে না, তাহা হইলেও ইংরাজদিগকেই গর্ব্বিত করিয়া তোলা হইবে।

ইংরাজ যদি আপনার তল্পী-তল্পা লইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেও হিন্দুস্থান অনাথ হইবে না। হয়ত উহারা চলিয়া গেলে আজ যাহারা চুপ করিয়া আছে তাহারা লড়াই করিতে আরম্ভ করিবে। ঝড়কে দমাইয়া রাখিয়া কোন লাভ নাই। তাহা বহিয়া যাওয়াই ভাল। এই জন্য যখন আমাদের ভিতরে ভিতরে লড়াই করিবার শক্তি পরিপক্ক হইয়া উঠিবে, তখন লড়াই করিতে দেওয়াই সঙ্গত। দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করার ওজুহাতে অন্য কাহারও আমাদের মধ্যে লাফালাফি করার দরকার নাই। এই ব্যবস্থাই আমাদিগকে কাপুরুষ করিয়া দিয়াছে। দুর্ব্বলকে এই প্রকারে রক্ষা করা উহাকে অধিক দুর্ব্বল করিবার কারণ, এই কথা উপলব্ধি করা ছাড়া স্বরাজ্য লাভ করা যাইতে পারে না। আমি আপনাকে এক ইংরাজ পাদ্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দিব। তিনি বলেন যে, স্বরাজ্য পাওয়ার ফলে, যদি অন্ধকার সহ্য করিতে হয় তাহাও ভাল, কিন্তু পর-রাজ্যের আলো ভাল নয়। তাহা দীনতা দূর করে না। ঐ পাদরীর স্বরাজ্য আর হিন্দুস্থানের স্বরাজ্যের আদর্শগত পার্থক্য আছে। হিন্দুস্থানীরই বলুন, আর সাদা লোকেরই বলুন, আমরা কাহারও অত্যাচার সহ্য করিতে চাই না। যে ডুবিতেছে তাহাকে সাঁতার শিখান দরকার। এই ধারণা যদি সত্য হয়, তবে গরমদল ও নরমদল একত্র হওয়া উচিত। একের অন্যকে অবিশ্বাস করা অথবা ভয় করার আবশ্যক নাই।

পাঠক—একথা ত আপনি দুই দলকেই বলিবেন। কিন্তু ইংরাজে কি বলিবেন ?

সম্পাদক—উহাকে সবিনয়ে বলিব যে, আপনি আমাদের রাজা,

ইহাতে সন্দেহ নাই। আপনি তলোয়ারের জোরে আছেন অথবা আমাদের সম্মতিতে আছেন এ কথা চর্চ্চা করার আবশ্যক নাই। আপনি যদি আমাদের দেশে থাকেন, তবে আমার তাহাতে বিদ্বেষ নাই; কিন্তু রাজা হইলেও আপনাকে ভৃত্য হইয়াই থাকিতে হইবে। আপনার কথা আমরা শুনিব না, আমাদের কথাই আপনাকে শুনিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশ হইতে যত ধন বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন উহা আপনি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আর এ রকম চলিবে না। আপনি হিন্দুস্থানের সিপাহীর কাজ করিতে যদি ইচ্ছা করেন তবে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বাণিজ্যের উপর আপনার লোভ ত্যাগ করিতে হইবে।

আপনি যে সভ্যতার সাহায্য করিয়া থাকেন তাহা আমরা অসভ্যতা বলিয়া মানি। আমাদের সভ্যতাকে আমরা আপনার সভ্যতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝি। ইহা যদি আপনিও বুঝিয়া ল'ন, তবে তাহাতে আপনারই সুবিধা হইবে। ইহা যদি না বোঝেন তবে আপনার কথানুসারে আপনাকে আমাদের দেশে আমাদেরই একজন হইয়া থাকিতে হইবে। আপনার দ্বারা আমাদের ধর্ম্মে যেন কোনও বাধা উপস্থিত না হয়। আপনি রাজা বলিয়া আপনারও ধর্ম্ম হইবে যে, আপনি হিন্দুর মনের দিকে চাহিয়া গোরু এবং মুসলমানের মনের দিকে চাহিয়া অন্যান্য নোংরা জানোয়ারের মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিবেন। আমরা দলিত হইয়া আছি বলিয়াই আজ আমরা এইরূপ করাইতে পারিতেছি না। কিন্তু এ কথা জানিবেন যে, ইহাতে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া আছে। এই কথা প্রকাশ করিয়া বলা আমরা অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছি। স্বার্থের জন্য বা কোনও ভয়ে আপনাকে একথা বলিতেছি না। আমাদের বিবেচনায়

আপনাদের পরিচালিত আদালত ও শিক্ষাশালা সকল কোনও কাজের হয় নাই। উহার বদলে আমাদের যে আসল আদালত ও পাঠশালা ছিল তাহাই আমাদের আবশ্যক।

হিন্দুস্থানের ভাষা ইংরাজী নহে হিন্দী। উহা আপনাকে শিখিতে হইবে। আমরা কাজ-কর্ম্মের সময় আপনার সহিত আমাদের ভাষা ব্যবহার করিব।

আপনি রেল ও সৈন্যদলের জন্য অসীম অর্থ লুটিতেছেন, আমরা এ দুটির কোনটিরই প্রয়োজন দেখি না। আপনার রাশিয়ার ভয় থাকিতে পারে, আমাদের নাই। যদি উহারা আসে তখন আমরা দেখিয়া লইব। আমাদের বিলাতী কাপড় আবশ্যক নাই। আমাদের এই দেশে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারাই আমরা কাজ চালাইয়া লইব। আপনি এক চক্ষু ম্যাঞ্চেষ্টারের দিকে, আর অপর চক্ষু আমাদের দিকে দিয়া থাকিবেন, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না। আপনার ও আমাদের স্বার্থ এক—এই কথা যদি বুঝিয়া চলেন, তবে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আপনাকে এই সকল কথা হঠকারিতার সহিত বলিতেছি না। আপনার নিকট অস্ত্রবল আছে। অনেক বৃহৎ নৌ-বাহিনী আছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রবল দ্বারা আমি যুঝিতে পারিব না। কিন্তু আপনি যদি উপরের কথা স্বীকার না করেন, তবে আপনার সহিত আমি একসঙ্গেও থাকিতে পারিব না। আপনার ইচ্ছা হয় ত যদি পারেন, তবে আমাদিগকে কাটিয়া ফেলুন, আমাদিগকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিন। কিন্তু আপনি যদি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করেন, তবে আমরা আপনার সহিত বসবাস করিতে পারিব না। আর আমাদের সাহায্য ছাড়া আপনি এক পাও চলিতে

পারেন না। সম্ভব যে আপনি এই সকল কথা অহঙ্কারবশতঃ হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। হাসা মিথ্যা। কেন না ইহা ত তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেওয়ার মত ব্যাপার নহে। কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে সামর্থ্য সঞ্চিত হয়, তবে আপনি দেখিয়া লইবেন যে, আপনাদের এই অহঙ্কার মিথ্যা। আপনার আজকার উপহাস বিপরীত বুদ্ধির চিহ্ন বলিয়াই সে দিন প্রমাণিত হইবে।

আমরা এ কথা মানি, আপনি অন্তরে অন্তরে ধার্ম্মিক রাষ্ট্রেরই মানুষ। আমরাও ধর্ম্মস্থানেই বাস করিতেছি। আপনারা ও আমরা কেমন করিয়া একসাথে বাঁধা পড়িলাম, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের এই সম্বন্ধ আমরা ভাল কাজে লাগাইতে পারি।

আপনারা যে সকল ইংরাজ হিন্দুস্থানে আসেন, তাঁহারা ইংরাজ রাজ্যের খাঁটি নমুনা নহেন। আর তেমনি আমরা যে সকল ভারতবাসী অর্দ্ধেক ইংরাজ হইয়া গিয়াছি, তাহারাও হিন্দুস্থানীর নমুনা নহি। ইংরাজ রাষ্ট্রের নিকট যদি আপনাদের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হয়, তবে তাঁহারা আপনাদের বিরুদ্ধতা করিবেন। হিন্দুস্থানী রাষ্ট্র আপনার সহিত কম সম্পর্কই রাখিয়াছে।

আপনার সভ্যতা যাহা সত্যিকার অসভ্যতা, তাহা ত্যাগ করিয়া যদি আপনি ধার্ম্মিক ভাবে অনুসন্ধান করেন, তবে দেখিবেন যে, আমরা যাহা চাহিয়াছি তাহাই ন্যায্য। এমনি করিয়া আপনি হিন্দুস্থানে থাকিতে পারেন। আর এমনি করিয়া যদি থাকেন, তবে আপনাদের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে, আমরা সে সকল শিখিয়া লইব। আমাদের নিকট হইতেও আপনাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে, তাহাও আপনারা শিখিবেন। এই ভাবে চলিলে আমরা পরস্পর লাভবান হইব, আর পৃথিবীরও লাভ

হইবে। কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থা কেবল তখনই হইতে পারিবে, যখন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পাঠক—রাষ্ট্রকে আপনি কি বলিবেন?

সম্পাদক—রাষ্ট্র কে?

পাঠক—যাঁহাদের কথা লইয়া আমি এবং আপনি আলোচনা করিতেছিলাম, অর্থাৎ যাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা এ দেশের স্বরাজ্যের জন্য ব্যগ্র।

সম্পাদক—এই রাষ্ট্রকে বলিব যে, যে-হিন্দুস্থানীর সত্যিকার স্বরাজের নেশা হইয়াছে, সে উপরের কথার অনুরূপ কথাই ইংরাজ-দিগকে বলিবে। সে আর উহাদের চাপে থাকিবে না। সত্যিকার স্বরাজের নেশা ত তাঁহারই হইবে যাঁহার ভিতর এই সংস্কার দৃঢ় হইয়াছে যে, হিন্দুস্থানের সভ্যতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর ইউরোপের সভ্যতা তিন দিনের তামাসা। এমনি কতই সভ্যতা সৃষ্ট হইয়াছে ও নষ্ট হইয়াছে; আরও কত হইবে ও যাইবে।

সত্যিকার স্বরাজ্য নেশা তাঁহারই আছে যে ব্যক্তি আত্মিক বলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শরীরের বলের কাছে পরাভব মানিবেন না, নির্ভয়ে থাকিবেন ও স্বপ্নেও অস্ত্রবল ব্যবহার করার কল্পনা করিবেন না।

সত্যিকার নেশা তাঁহারই হইতে পারে, যিনি ভারতবর্ষের আধুনিক দীন অবস্থায় ব্যকুল হইয়া পড়িয়াছেন ও বিষের পাত্র প্রথমেই পান করিয়া লইয়াছেন।

একজন হিন্দুস্থানীও যদি এ রকমের হয়, তবে সে ইংরাজদিগকে উপরোক্ত কথাগুলিই শুনাইয়া দিবে এবং সে কথা ইংরাজদিগকে শুনিতেও হইবে।

এ গুলি ত দাবী নহে ইহা হিন্দুস্থানের মনের অবস্থা বোঝানো মাত্র। চাহিলে এ জিনিষ পাওয়া যায় না, ইহা পাওয়ার জন্য শক্তি চাই। এই শক্তি তখনই আমাদের ভিতরে জাগ্রত হইয়া উঠিবে যখন—

(১) ইংরাজী ভাষা আমরা কেবল সেই খানেই ব্যবহার করিব যেখানে উহা ব্যতীত কার্য্য চলিতে পারে না।

(২) যখন উকিল ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া নিজ ঘরে চরখা চালাইয়া কাপড় বুনিবেন।

(৩) যখন উকীল নিজের জ্ঞান কেবল লোককে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করিবেন ও ইংরাজদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করিবেন।

(৪) যখন উকীল বাদী-প্রতিবাদীর ঝগড়ায় পড়িবেন না, আদালত ছাড়িয়া দিবেন, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া অপরকে ঐ ব্যবসা ছাড়িবার কথা বলিবেন।

(৫) যখন উকীল যেমন ওকালতী ত্যাগ করিবেন তেমনি জজিয়তিও গ্রহণ করিবেন না।

(৬) যখন ডাক্তার, তাঁহার ধর্ম্ম যাহাই হোক্, একথা বুঝিবেন যে, হাসপাতালে জীবের যে দুর্গতি হয় তাহাতে হাসপাতালের দ্বারা শরীর নিরোগ করা অপেক্ষা, রোগ থাকে তাহাও ভাল।

(৭) যখন ডাক্তার নিজের ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন এবং তিনি লোকের শরীর ভাল করা অপেক্ষা আত্মাকে শুদ্ধ করিয়া উহাকে নীরোগ করাই নিজের কর্ত্তব্য বুঝিবেন।

(৮) যখন ডাক্তার চরখা চালাইবেন আর ব্যাধির আসল কারণ বাহির করিয়া উহা দূর করিবার উপদেশ দিবেন ও অকেজো

ঔষধ দিয়া রোগীকে ঠকাইবেন না। যখন বুঝিবেন যে, অকেজো ঔষধ ব্যবহার করার পরিবর্ত্তে যদি রোগীর মৃত্যু হয় তবে তাহাতে পৃথিবীর ক্ষতি হইবে না বরং তাহার দ্বারা তাহার কল্যাণই হইবে।

(৯) যখন ধনবান অর্থনাশ হওয়ার ভয় না করিয়া হৃদয়ের অনুভূতি নির্ভয়ে অপরকে বলিবেন।

(১০) যখন ধনী নিজের ধন চরখার কাজে লাগাইবেন, আর নিজে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া অপরকে উৎসাহিত করিবেন।

(১১) যখন সকল হিন্দুস্থানী অনুভব করিবেন যে, এখন শোক ও প্রায়শ্চিত্ত করার সময়।

(১২) যখন সকলে বুঝিবেন যে, ইংরাজকে দোষ দেওয়া নিরর্থক। তাহারা আমাদের দোষেই আসিয়াছে, আমাদের দোষেই টিকিয়া আছে, আর আমাদের নিজেদের দোষ দূর হইলেই হয় চলিয়া যাইবে, না হয় বদলাইয়া যাইবে।

(১৩) যখন সকলে বুঝিবেন যে, শোকের অবস্থায় আমোদ করা ও শোক করা দুই কার্য্যই চলে না। যতদিন না দেশের স্বস্তি আসিতেছে ততদিন হয় জেলে, নয় ত দেশোদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত থাকাই ঠিক।

(১৪) যখন আমরা বুঝিব যে, জেলের বাহিরে থাকিয়া লোককে বুঝাইবার যে কার্য্য করিতেছি, আমি জেলে গেলে সে কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ ভাবা সম্পূর্ণ ভ্রম, এবং এই ভ্রমের বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

(১৫) যখন সকলে জানিবেন যে, বক্তৃতা করা অপেক্ষা কার্য্য করার শক্তি অধিক। যখন নির্ভীক ভাবে মনের কথা বলিয়া সকলে তাহার পরিণাম ভোগ করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং

এইরূপ ভাবে কথা বলার দ্বারাই অপরের মনে দাগ কাটা যায়, এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

(১৬) যখন সকল হিন্দুস্থানীই বুঝিবেন যে, আমরা কষ্ট সহ্য করিয়াই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি।

(১৭) যখন সকলে ইহা বুঝিবেন যে, ইংরাজের সভ্যতাকে উৎসাহ দিয়া আমরা যে পাপ করিয়াছি, তাহা নিবারণ করিবার জন্য যদি জীবনান্ত পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে থাকিতে হয় তাহা হইলেও তাহা বেশী নয়।

(১৮) যখন সকলে এ কথা বুঝিবেন যে, কোন জাতিই কষ্ট না করিয়া বড় হয় নাই। যুদ্ধাদির ব্যাপারেও অন্যকে হত্যা করা নহে, কষ্ট সহ্য করাই সত্যকার পরীক্ষা, এবং সত্যাগ্রহীদের সত্যকার পরীক্ষাও এই কষ্ট-সহিষ্ণুতার উপরেই নির্ভর করে।

(১৯) যখন সকলে বুঝিবেন যে, "যখন সকলে করিবে তখন করিব" এ প্রকার বলা না-করার ভান করার সমান। আমার যাহা ভাল লাগে তাহা করিব, অপরের যাহা ভাল লাগে সে তাহা করিবে। কাজ করিবার পথই এই। যখন মুখের সামনে সুস্বাদু খাদ্য আসে তখন তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কাহারও জন্য বসিয়া থাকি না। জাতির মুক্তির জন্য একটা দুঃখ ভোগ করা সুস্বাদু খাদ্য ভোজনের সমান। কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ দুঃখ ভোগ করা পাগলামি।

পাঠক—এমন কি সকলে করিতে পারিবে?

সম্পাদক—আপনি আবার ভুল করিতেছেন। সকলে কি করিবে ইহা লইয়া আপনার ও আমার কি দরকার? আপনি আপনার বুঝ বুঝিবেন, আমিও নিজের পথ সামলাইয়া লইব, যদিও ইহা স্বার্থপরের বাক্যের মত শুনায়, বাস্তবিক পক্ষে ইহাই পরামার্থ বাক্য।

আমি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিব, ইহাতেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

আপনার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে আর একবার আপনাকে জানাইতে চাই যে :—

(১) স্বরাজ্য নিজের মনের রাজ্য।

(২) উহার চাবি সত্যাগ্রহ, আত্মবল বা দয়াবল।

(৩) ঐ বল সংগ্রহ করার জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী গ্রহণ কর আবশ্যক।

(৪) আমরা যাহা করিতে চাই, তাহা আমাদের কর্ত্তব্য বোধেই করিতে চাহিতেছি, ইহাতে ইংরাজের প্রতি দ্বেষ নাই, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার ইচ্ছা নাই। এইজন্যই ইংরাজ যদি নুনের ট্যাক্স উঠাইয়া লয়, যে ধন এ দেশ হইতে লইয়াছে তাহা যদি ফিরাইয়া দেয় এবং সকল হিন্দুস্থানীকে বড় বড় চাকরী দেয়, সৈন্য সামন্ত সরাইয়া লয়, তাহা হইলেই কি আমরা উহাদের মিলের কাপড় পরিব বা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিব, অথবা উহাদের কলা-কৌশল আমরা ব্যবহার করিতে থাকিব? তাহা নহে। ঐ সকল কার্য্য করণীয় নহে বলিয়াই পরিহার করিতে হইবে।

যাহা কিছু আমি বলিয়াছি তাহা ইংরাজের সহিত বিরোধ বশতঃ নহে, পরন্তু উহাদের সভ্যতার সহিত বিরোধ বশতঃ বলিয়াছি। আমার মনে হইতেছে যে, আমরা স্বরাজ কথাটাই শিখিয়া লইয়াছি, উহার রূপ বুঝিতে পারি নাই। আমি নিজে যেমন বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং আমার ধর্ম্ম জানে যে, এই স্বরাজ লাভের জন্যই আমার সমস্ত জীবনও আজ উৎসর্গীকৃত।